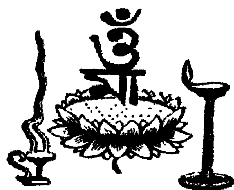
মা আনন্দময়ীর কথা



মা আনন্দময়ীর কথা

অভয়

আনন্দময়ী বিশ্বমন্দির, কিশনপুর,
দেরাদূন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা ঃ—
(১) শ্রীযতীশ চন্দ্র গুহ
১, পার্কসাইড রোড, কালীঘাট, কলিকাতা
(২) আনন্দময়ী আশ্রম, রমনা, ঢাকা

মাঘ—১৩৪২

প্রিণ্টার—শ্রীকালীশঙ্কর বাক্‌চি ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস,
১৯নং গুলুওস্তাগর লেন, কলিকাতা।



মা

মা আনন্দময়ীর কথা



শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সঙ্গ কিছুকাল করিবার পর আমার মনে কেবলই এই প্রশ্ন আসিতে লাগিল, ইনি কে? আমি অনেক মহাপুরুষের জীবনেতিহাস ও বাণী পাঠ করিয়াছি, দুইচার জন সাধকের সঙ্গ করিবারও সুযোগ হইয়াছে। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা এবং বিচার দ্বারা মাকে ধরিতে চেষ্টা করিলাম। যতই দিন যাইতে লাগিল, কোনও সামঞ্জস্য পাইলাম না। সময়ে সময়ে বিরক্তি ও ক্রোধবশতঃ খুবই ঝগ্‌ড়া করিয়াছি, কিন্তু মায়ের ব্যবহারিক চরিত্রের সৌন্দর্য্য, উদারতা, মহান্‌ ভাব এগুলি ক্রমে এমন একটা আদর্শ আমার চোখের সাম্‌নে খাড়া করিল যাহা আমি অস্বীকার করিতে পারিলাম না। আমার পূর্ব্বের ধারণা ও মতবাদ শিথিল হইয়া গেল।

মায়ের কাছে গেলে মনে হইতে থাকে—করুণা, পরের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া, প্রেম এই সকল ভাব যেন একটি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছে।

বাল্যকাল হইতেই মায়ের চরিত্রে সকল সদ্‌গুণের এক অভূতপূর্ব্ব বিকাশ দেখা গিয়াছে। তাঁহার প্রতি কর্মে, প্রতি ভাবে এক অপূর্ব্ব পূর্ণতা এবং অলৌকিক মাধুর্য্য— যাহা জীবকে আকর্ষণ করে।

কামক্রোধাদি রিপু এবং রাগাদ্বেষাদি কখনও মায়ের শরীরকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয় নাই। শুনিয়াছি, মা যখন লৌকিক পতির সঙ্গে ঘরকন্না করিতেন, পতি শ্রীশ্রীভোলানাথের কাছে মায়ের এই সহজ নিবৃত্ত ভাব বড়ো অদ্ভুত ঠেকিত। "সাংসারিক সুখ ঘটিল না" বলিয়া কখনও দুঃখ করিতেন। বস্তুতঃ, মায়ের উপর একটা বিশেষ ভালোবাসা, পূর্ণসত্ত্বময়ী মায়ের অলৌকিক প্রভাব এবং অপূর্ব্ব সেবা এই তিনই ভোলানাথকে দারান্তর পরিগ্রহ করিতে নিবৃত্ত করিয়াছিল এবং ধৈর্য্যধারণ করিতে ও কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত থাকিতে সমর্থ রাখিয়াছিল। যখন ভোলানাথের সঙ্গে থাকিতেন তখন মায়ের ভাব কিরূপ ছিল, এ প্রসঙ্গে মা একদিন বলিয়াছিলেন, **"পিতার কাছে পুত্রী যেমন থাকে, ভোলানাথের কাছে আমি তেমনই থাকিতাম।"** মায়ের মত এরূপ নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ইতিহাসে আর পাওয়া যায় নাই বলিয়াই জানি।

অবিরত বিরুদ্ধ ভাবের নিষ্পেষণে ধরিত্রীদেবীরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু ধীরতা মূর্ত্তিমতী মা আমার যে ভাবে সহস্র বিক্ষোভের মধ্যে অচল অটল—আপনাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন অথচ স্বভাবের প্রেরণায় সকলের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিতেছেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। যে আসিয়া যাহা করিতেছে মায়ের তিলমাত্র বিরক্তি বা অতিষ্ঠতা নাই; বুক পাতিয়া দিয়া আছেন।

বস্তুতঃ 'সহন করিতেছেন' এ কথা মায়ের সম্বন্ধে খাটে না, কারণ কষ্ট থাকিলে তবে তো সহন। মা তো এক আনন্দের খেলা দেখিয়া যাইতেছেন।

যাঁহারাই মায়ের সঙ্গে একটুও মিশিয়াছেন মায়ের শুদ্ধ, দিব্য, পবিত্র চরিত্র দেখিয়া মাতৃচরণে নিজকে না লুটাইয়া পারেন নাই। সেখানে মায়ার লেশও নাই। ছোটকালেই এই নির্লিপ্ত ভাব, এই 'আপনাতে আপনি আছেন' ভাবের জন্য গর্ভধারিণী মায়ের নিকট ট্যালা, হাবা ইত্যাদি আখ্যা পাইয়াছিলেন। যখন মায়ের কর্ম-জীবন আসিল তাঁহার সম্পূর্ণ নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ সেবাতে ভোলানাথ এবং অন্যান্য পরিজনবর্গ বিশেষ আকৃষ্ট না হইয়া পারেন নাই। এমন কি গার্হস্থ্যজীবনে, কর্মাদির মধ্যে নানা বিষয় হইতে রসগ্রহণ বা ভোগে সম্পূর্ণ বিরতা

দেখিয়া মায়ের সমবয়স্কা মেয়েরা মাকে ঠাট্টা করিতে ছাড়িতেন না। বলিতেন, "এ কি রকম! রস্‌কস্‌ নাই।"

অথচ কর্মের মধ্যে মায়ের সহজ আনন্দের ভাব এবং হাসিমুখ দেখিয়া সকলেই ভালো না বাসিয়া পারিতেন না। সর্ব্বদা হাসি মুখ ও প্রসন্ন ভাব দেখিয়া বাজিতপুরে সারদার মাসীমা মায়ের নাম রাখিয়াছিলেন, "খুসীর মা"।

১৭।১৮ বৎসর বয়স হইতে ২৯।৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মায়ের শরীর আশ্রয় করিয়া সাধনার নানারূপ অবস্থা প্রকাশ পায়। সাধনার যত ধারা, যত ভাব সবই প্রকাশ পাইয়াছিল। সাধন-জগতে এমন কোনও অনুভূতিই নাই যাহা 'সাধিকা মা'য়ের নিকট ধরা পড়িয়াছিল না। শাস্ত্রাদিতে পাই সাধনার পথে যেমন বিবেক, সদসৎ বিচার, আকুলতা আসে আবার ভীতি, বিস্ময় এ সকলও আসে। অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য হইলেও সকল ভাবই মায়ের কাছে তন্ন তন্ন করিয়াই সাড়া দিয়াছিল।

অষ্টগ্রামে মা প্রথম নামসাধন করিতে আরম্ভ করেন। ছোট কালে পিতার কাছে হরির মাহাত্ম্য শুনিয়াছিলেন তাই নিজে নিজেই হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলেন। যে দিন আরম্ভ করিলেন তার পরের দিন হইতেই নামে আনন্দের প্রকাশ হইতে লাগিল। এই ভাবে মায়ের

সাধন-লীলার সুরু হয়। প্রাণগোপালবাবুকে লিখিত লিপিতে মা ঐ সময়কার অবস্থার কথা কিঞ্চিন্মাত্র লিখিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলি—ঐ সময়ে সাধনার খেলা সুরু লইলেও জন্ম হইতে মায়ের নানাবিধ লোকোত্তর ভাবের প্রকাশ হইত। ছোটবেলায় কীর্ত্তনাদিতে কখনও মায়ের যে ভাবাবেশ হইত, মায়ের জননী উহা নিদ্রা বলিয়া মনে করিতেন।

সাধনার ধারাগুলিকে প্রধানতঃ এই চার ভাগে ভাগ করা যায়,—ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্যোগ, রাজযোগ। এর মধ্যেই লয়যোগ, মন্ত্রযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি আছে। ভক্তিসাধনাও আবার নানারকম আছে। তন্ত্রানুসারে নানাবিধ পূজা এবং অন্যান্য উপাসনার অঙ্গ বৈধী ভক্তির মধ্যে পড়ে। আর আছে নামসাধন ও বৈষ্ণবের ভাব-সাধনা। সাধনার রাজ্যে আরও কত রকম কি আছে সে সকলের বিশেষ বিশ্লেষণ এই আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। তবে দেখিতে পাওয়া যায় এই সমুদয়ই মায়ের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

বাজিতপুরে যখন প্রবলভাবে সাধনক্রিয়া চলিতেছিল, তখন তন্ত্রোক্ত দেবদেবীপূজা মায়ের দ্বারা যথাবিধি সম্পাদিত হয়। আমরা যে পূজা করি তাহার মধ্যে কত ভুল, কত

ত্রুটী, কত অঙ্গহানি, কত গোঁজামিল থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। আর মা যে করিতেন তাহা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধিত হইত। পূজার প্রতি ক্রিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিত। প্রথমে মা দেবতার সহিত অভিন্ন হইয়া অর্থাৎ নিজ শরীরে ক্রিয়াদির দ্বারা দেবতাকে ফুটাইয়া নিজ অঙ্গেই দেবপূজা সম্পাদন করিতেন (দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ)। তৎপরে ঐ দেবতাকে শরীর হইতে বহির্গত করিয়া বাহিরে সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিতেন। বিচিত্র এই যে, পূজোপকরণ সমস্তই অলৌকিক ভাবে মায়ের শরীর হইতে সৃষ্ট হইত।

এই পূজাকালে মা সাধারণতঃ দরজা বন্ধ করিয়া বসিতেন। কেহ কোনও সময় দেখিতে পাইয়া ভয় পাইয়াছিল শুনিয়াছি।

পূজাদি যখন শেষ হইয়া আসিল অসংখ্য প্রকার আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা প্রভৃতি যোগক্রিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। কত রকমের অনুভূতি তাহা ধারণা হয় না। কত রকমের রূপদর্শন, লীলাআস্বাদন, জ্যোতিদর্শন, কত বাণীশ্রবণ, কত প্রকারের আনন্দ, কত রকমের ভাবাবেশ তাহার সংখ্যা নাই। অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যেরও বিকাশ হইয়াছিল। সমাধিও অনেক রকম হইতে লাগিল।

জ্ঞানের যখন প্রকাশ হইল তাহারও অবস্থাভেদে সূক্ষ্ম

তারতম্য আছে। সৃষ্টি কি, কারণ কি, কোন তত্ত্ব কি এসব তন্ন তন্ন করিরা খুলিয়া গেল। মা এমন অবস্থায় উপনীত হইলেন যখন (মায়ের ভাষায়) "**নিজকে নিয়াই দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, নিজে নিজেই মশ্‌গুল্‌। সে আনন্দ মুখে প্রকাশ করা যায় না।**"

ক্রমে এমন হইল যখন—"যুগপৎ সব ; সগুণ, নির্গুণ ; আবার সগুণ, নির্গুণের পরেও। একেবারে শান্ত অবস্থা। বহু থাকা সত্ত্বেও দেখ্‌ছি এক। সবই আছে অথচ কিছুই নাই। কী যে ভাষায় বলা যায় না।"

মা মৌনী হইয়া গেলেন। এ কেবলমাত্র বাক্যের সংযম নহে। ভিতর বাহির এক করিয়া মৌনী হইয়া গেলেন। যেন প্রশান্তি মূর্ত্তিমতী।

আবার উত্তরকালে ঢাকাতে বৈষ্ণবীয় প্রেমের চূড়ান্ত প্রকাশ হইয়াছিল। "এক অনির্ব্বচনীয় মহাভাবের উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া বিভোর অবস্থায় কখনও কখনও প্রহরের পর প্রহর পড়িয়া থাকিতেন।" আবার কীর্ত্তনের সময় নানারূপ ভাবের বিকাশ হইত। তখন কোনও লোকাতীত ভাবের প্রবাহ মায়ের শরীরকে আশ্রয় করিয়া নৃত্য করিয়া চলিয়াছে এরূপ বোধ হইত। শরীর কখনও

গড়াইত, কখনও প্রেমাবেশে নৃত্য করিত। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মত অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসকল দেহে প্রস্ফুটিত হইত। ঐ সময়ে বহু ভক্তের সমাগম হইত। যাঁহারা মায়ের এই মহাভাবের লীলা দেখিতেন, একেবারে মজিয়া যাইতেন। কখনও কখনও মায়ের মুখনিঃসৃত সূক্ত বা স্তোত্র (দেবভাষায়) এক অপরূপ ভাবব্যঞ্জনা আনিয়া দিয়া ভক্তজনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিত। (১)

মায়ের সাধনার অবস্থার কথা কত কহিব ? কয়টাই বা প্রকাশ পাইয়াছে ? লোকচক্ষুর অগোচরে দ্বাররুদ্ধ কক্ষে কি কি খেলা হইয়াছিল তাহা ত জানিবার কোনই উপায় নাই। অনুভূতির রাজ্যের কথা তো স্বতন্ত্র। মা কৃপা করিয়া যতটুক বলেন সেই মাত্র। যতটা বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে এবং যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহাও বিশদ্ ব্যাপার, এখানে উল্লেখ বাহুল্য।

আবার কর্মজীবনে ঐকান্তিকী পতিভক্তি, নিজকে বিলাইয়া দিয়া সেবা এবং অদ্ভুত কর্মতৎপরতা মায়ের পূর্ণতারই পরিচয় দেয়।

মায়ের এই অশ্রুতপূর্ব্ব সাধনার ইতিহাস হইতে আমরা

---

(১) শেষের দিকে ভাবাবস্থা এবং যোগাবস্থা গুলি একটি অখণ্ড ভাবের উপর দিয়া খেলা করিয়া যাইত—মায়ের মুখে এ প্রকার শুনিয়াছি।

তো মাকে সাধকরূপে পাই না। সাধক হইয়াও সাধক নহেন। মায়ের দেহ প্রারব্ধকর্ম ফল ভোগের নিমিত্ত হয় নাই। মা একদিন বলিয়াছিলেন,—

"সাধনার একটি স্তরে গেলে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি পাওয়া যায়। এ শরীরের তো ঐ জাতীয় কিছু পাওয়ার নয়।"

আবার কখনও বলিয়াছেন,—

"এ শরীরটার সাধনার অবস্থাও যা, হাসি-খেলাও তা, তোদের কাছে এক এক সময় এক একটা প্রকাশ পায় মাত্র। আমি সব সময় যা' তা-ই আছি।"

ঢাকাতে দিন দিন যখন লোকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন তখন স্বাভাবিক ভাবেই মায়ের বধূত্বের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া গেল। মাতৃরূপে সকলেই পাইতে লাগিলেন। মাথার ঘোম্‌টা আপনিই পড়িয়া যাইত। প্রথম প্রথম ভোলানাথ ইহাতে নানারূপ আপত্তি করিতেন, কিন্তু ক্রমে দেখিলেন এ বস্তুটি তাঁহার একমাত্র নহে, সকলের ধন—আপনা আপনিই যাহা ঘটিবার ঘটিতেছে। ভোলানাথ জানিতেন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার আদেশ যথাসাধ্য পালন করে, কিন্তু তিনি দেখিলেন তাঁহার স্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব নাই, তাই তাঁহারও কর্ত্তৃত্ব চলিত না।

মা বাহিরে আসিলেন, হিমালয়ে দেরাদূনে বহুদিন রহিলেন। কিন্তু মা তো এক জায়গায় অল্প লোকের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধভাবে থাকিবেন না। ক্লান্তি নাই, পরিশ্রম নাই, বিরক্তি নাই, শারীরিক সুবিধা অসুবিধা নাই—তিনি যেখানে সেখানে ছুটিয়া ছুটিয়া যাইবেনই। কৃপা উচ্চতা, নীচতা, ঐশ্বর্য্য, দারিদ্র্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। ব্যবহারিক জগতে কারও কারও চোখে মায়ের ঘোরাফিরা ভালো লাগে না হয় ত। তাঁহারা মাকে জানেন না তাই এরূপ হয়। মায়ের নিত্য এরূপ ছুটাছুটীর কী প্রয়োজন! জগন্মাতার অসীম করুণা ও প্রেম কেহ বুঝিল না।

আমরাই যে মায়ের চরণে উপস্থিত হইয়া ভক্তি, জ্ঞান প্রার্থনা করি তা নয়, সূক্ষ্মতর উন্নত স্তরের মহাপুরুষ, যোগী, ঋষি এঁরাও কৃপাভিক্ষা করিতে সমাগত হ'ন। মায়ের মুখে কখনও শুনিয়াছি, কেহ কেহ প্রত্যক্ষও করিয়াছেন। এই জাতীয় ঘটনা মা প্রায় বলিতে চাহেন না, চাপা দিয়া যান।

মা এখন স্বাভাবিক অবস্থায়ই আছেন। সহজ, শান্ত ভাব। মধ্যে দেহাশ্রয়ে সাধনাবস্থাগুলি অভিনীত হইয়া গেছে মাত্র, আগেও যেমন এখনও তেমন। অলৌকিক বিভূতির স্ফুরণ এখন প্রায় শান্ত। যে লোকোত্তর সূক্ষ্ম

ক্রিয়াসমূহ উন্মুক্তির পথে কার্য্য করিত তাহা তেজস্বী ভাস্করের মত লোকের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দিত। এখন মা উজ্জ্বল হইলেও স্নিগ্ধ।

গুণসমূহ আদর্শরূপে কাহারও চরিত্রে বর্ত্তমান থাকিলে কিরূপ অভিব্যক্তি ঘটে তাহা পূর্ব্বে জানা ছিল না। মায়ের চরিত্রে আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি। যত যত মহাপুরুষের কথা এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি, এমন কি যাঁহাদিগকে ভগবানের অবতার বলা হয় তাঁহাদিগের কাহারও সহিত মায়ের সাদৃশ্য নাই। মোট কথা, মায়ের মধ্যে যাহা পাইয়াছি তাহা অপেক্ষা আদর্শের পূর্ণতর বিকাশ আমি আর পাই নাই। আমি এ বাহুল্যোক্তি করিতেছি না। আবার মায়ের উপর গভীর বিশ্বাসের স্পর্দ্ধাও রাখি না। আমি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি। আমার অবিশ্বাসের এবং সংশয়ের যে জ্বালা ভোগ করিয়াছি ও করিতেছি তাহা ডায়েরীতেও সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিবার অবসর ঘটে নাই। তবে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়া মায়ের সঙ্গে দুই বৎসর নিরন্তর সঙ্গ করিবার ফলে যেটুক অভিজ্ঞতা সহজ ভাবে আমার মনে বসিয়া গিয়াছে তাহা হইতেই কথাটি বলিলাম।

মায়ের সহিত একটু মিশিলেই দেখা যায় মায়ের মধ্যে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অপরিমেয় বুদ্ধির সহিত শিশুর সারল্যের এক

অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে। প্রকৃতি অনন্তমুখী। ভক্তেরা এক একজন এক এক প্রকার ভাব, অধিকার, গতি লইয়া মায়ের চরণে উপস্থিত হ'ন। মা একা সকলের মনোজগতের অধিশ্বরী হইয়া সকলেরটা আলাদা আলাদা ভাবে চালাইতেছেন। আবার ব্যবহারিক হিসাবে দেখা যায় মাকে সকলে মিলিয়া চালাইতেছে। খাওয়াইয়া দিলে খান, ঠাণ্ডা লাগে বা গরম লাগে বুঝিয়া তদনুরূপ বস্ত্রের ব্যবস্থা ভক্তেরাই করেন। কথাবার্ত্তায়ও যাহা ইচ্ছা বলি না কেন মায়ের প্রতিবাদ নাই। এ হিসাবে মা ভক্তদের হাতের পুতুলমাত্র।

আর একটা জিনিষ আছে যা মায়ের মধ্যেই সম্ভব, সাধারণ জীবে সম্ভব নহে। উহা অসামান্য আকর্ষণ। এই আকর্ষণেই এক সময়ে বৃন্দাবনের পশুপাখী পর্য্যন্ত আত্মহারা হইয়াছিলেন। যদি মায়ের আকর্ষণ না দেখিতাম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের কাহিনী হয় ত বা অবিশ্বাস করিতাম। যদিও গোপীগণের মত প্রেম এবং প্রহ্লাদাদির মত ভক্তি মায়ের ভক্তগণের (১) সকলের মধ্যে দেখা যায়

(১) স্বর্গাদি হইতে উচ্চতর লোকে মায়ের সহিত ভক্তদের অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা হয় মায়ের মুখে শুনিয়াছি। একদিন তাহার ক্রিয়া এবং গান মায়ের এই স্থূল শরীরে পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছিল।

না, কিন্তু মাকে দর্শন করিলেই সকলেই কমবেশী আকর্ষণ অনুভব করেন ইহা অস্বীকার করা যায় না। ঢাকাতে কীর্ত্তনকালে মা যখন বসিয়া থাকিতেন ছাগল কুকুর আসিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়াছে এরূপ দেখা গিয়াছে।

মা দীক্ষা দেন না সত্য, কিন্তু দেখা গিয়াছে বহু ত্রিতাপ-প্রপীড়িত জীব মায়ের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছে। অনেকেই মাকে আপন ইষ্টরূপে জানিয়া মায়ের আশ্রয়ে আধ্যাত্মিক নানা অনুভূতি লাভ করিতেছেন, পরমানন্দ লাভের পথে অগ্রসর হইতেছেন। উচ্চাধিকার-সম্পন্ন ব্যক্তিরা মাকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্য পাইতেছেন। কেহ ইষ্টদেবতারূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কাহারও নিকট মা প্রেমের এক মধুময় বিগ্রহরূপে প্রকটিতা, আবার কেহ বা মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সেই মহান্ সত্তায় ক্রমে আপনাকে মিলাইয়া দিতেছেন।

মা কি? এই সম্বন্ধে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। অনন্তভাবময়ী মায়ের সম্বন্ধে যাহা কিছুই বলা যায় না কেন সবই অসম্পূর্ণ।

১৩৪৪ সালের পৌষ মাস হইতে মায়ের সঙ্গ লাভের সুযোগ লাভ করি।—ঐ সময় হইতে যে ডায়েরী লিখিয়া আসিতেছি তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

২৫শে পৌষ, ১৩৪৪। 9th January.'38
আনন্দময়ী আশ্রম, কিশনপুর, দেরাদূন।

আজ সন্ধ্যার আগ হইতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা সর্বক্ষণই প্রায় মায়ের কাছে মায়ের কথা শুনিয়াছি। অনেক অদ্ভুত ব্যাপারও দেখিলাম। মা কথায় কথায় পুরাতন কথা সব বলিতেছেন।

তখন মা'র গলায় সব অনেক ভারী ভারী সোনার গহনা ছিল, হাতেও অনেক চূড়ি ছিল। সে সব অনেক সময়ে পড়িয়া যাইত আর যে কেহ তাহা তুলিয়া লইত। কোনও ঠিক্ থাকিত না। আবার একদিন একটি মেয়ে "আমি মা'র হাতের চূড়ি নিব" এই বলিয়া মা'র হাত লইয়া সোনার চূড়ি খুলিতে বসিলেন। একাকী! এমন সময় লোক-জন আসিয়া পড়িল। সবাই হাঁ হাঁ করিয়া আসিল। কিন্তু মা বলিলেন,—

"ও নিক্ না। ফুলের মালা যখন দেওয়া হয় তখন ত কই কেউ কিছু বলে না!"

আরও অনেক ঘটনা মা বলিলেন। বেশ রস করিয়া বলিতেছেন ; সকলে হাসিয়া অস্থির, মাও হাসিতেছেন।

তারপরে মা এক lady doctor সেবাজীর (সারদা) কথা বলিলেন। তিনি জ্যোতীশ বাবুর (ভাইজী) নিকট হইতে উপদেশ (১) লইয়া না যোগ, না সন্ধ্যা-পূজা কেবল জপ করিতেন। (নৈতিক সবলতা যথেষ্ট ছিল)। ধ্যানও না। ক্রমে এখন সময়ে সময়ে এ'রকম ভাব হইতেছে তাহাতে গলার আওয়াজ ও দেহের সাড় নষ্ট হইয়া যায়। এই নিয়ে চাকরীর অসুবিধা হয়।

ক্রমে planchet এর কথা হইল। আমি পূর্ব্বে একরকম প্রক্রিয়া করিতাম, স্পর্শমাত্র সাহায্যে টুপী ইত্যাদিকে নড়াইতাম। মা তাহা ঝুড়ির সাহায্যে করিতে বলিলেন। করা হইল কিন্তু সুবিধা হইল না। যোগেশদা pencil ধরিয়া বসিলেন। দাগ পড়িতে লাগিল, কিন্তু লেখা পড়িল না। মা হাস্যকৌতুক করিতে লাগিলেন।

আমার এক মাসী আত্মহত্যা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। আমি সে সকল কথা বলিলাম। আমার যে সে সময় আত্মহত্যা করার ঝোঁক হইয়াছিল তাহাও বলিলাম।

(১) পরে জানা গেল ভাইজী তাঁহাকে দীক্ষা দেন।

আমি—তখন কি সে ঘাড়ে চেপেছিল ?

মা—**সে ঘাড়ে চাপে নাই, সেই ভাবটা ঢুকিয়া গিয়াছিল।**

মা আবার বলিতেছেন, "**সে এখানেই আছে।**" (১)

আমি—কেন ?

মা—**না হ'লে তুমি তার কথা বল্‌ছ কেন ?**

শুইবার সময় হওয়া সত্বেও মা আমায় তাঁহার কাছে বসাইয়া রাখিলেন। শেষে দেখি lady doctor হাজির। মা তাঁহার সহিত হাসি তামাসা করিতে লাগিলেন।

মা তাঁহাকে pencil ধরিয়া যোগেশদার মত বসিতে বলিলেন। বসিতে বসিতেই সেই ভাব হইল। সমুদয় ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ হইল। শ্বাসক্রিয়া আরম্ভ হইল। এইরূপ অনেকক্ষণ রহিল। চক্ষু অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল। আবার খুলিল। তখন দেখা গেল যে ভ্রূমধ্যে স্থির দৃষ্টি সংলগ্ন রহিয়াছে। কখনও কথা চলে, কখনও না।

এই ভাবকে কেহ নাকি হিষ্টিরিয়া বলে। আমার তা' মনে হয় না। মায়ের কথাতেও তাহাই (উহা যে হিষ্টিরিয়া নহে) বুঝিলাম।

মেয়েটি একেবারে পবিত্রা, সত্যপরায়ণা আর সরলা।

(১) মা পরে বলিয়াছেন, মা একটি ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন।

এই তিনটি গুণকে ভিত্তি করিয়া তাহার জীবন গঠিত। রাত্রে তাহার নাকি ঘুম প্রায় আসেই না, জপ আপনা আপনি আসিয়া পড়ে।

মেয়েটির এই ভাবের সময়েও মা রঙ্গরস করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন,—

"একেবারে সাচ্চা জিনিষ—ভিতরে অনুকরণের ভাব একেবারেই নাই, যা অনেকেরই আছে।

প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা, কামনা, নিন্দা, হিংসা এসব হচ্ছে সোনার ভিতরের খাদ। নাম কর্‌তে কর্‌তে ওসব একটু একটু করে কমে যায়। আসল সোনা বাহির হয়ে পড়ে।"

কথাপ্রসঙ্গে একজন মাতাজীর কথা উঠিল। মা বলিলেন,—

"তিনি নিজেই বলিয়াছেন, সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা কীর্ত্তনে ভাবের সময় তাঁহার ভালো লাগে, তাহা হইলেই তাঁহার অভাববোধ আছে।"...

মা—জগতে প্রায়ই সোনাকে পিতল আর পিতলকে সোনা বলিয়া ভুল হয়। বাহিরের লক্ষণ

দেখিয়া কিন্তু অনেকটা ধরা যায়। ঠিক্ মত হইলে তাহার চালচলন, খাওয়া দাওয়া কথাবার্ত্তা সবই বদ্‌লাইবেই। তবে সবসময় লক্ষণ দেখে ধরা শক্ত। তোমাদের ভাইজী (জ্যোতীশ বাবু) হাতের লেখা, কথা, বই এসব দেখিয়াই কে কেমন লোক বলিয়া দিত।

সেবাজী অনেক রাত্রে চলিয়া গেলেন।

১লা মাঘ, শনিবার, ১৩৪৪। **15th Jan.' 38**
আনন্দময়ী আশ্রম, কিশনপুর, দেরাদুন।

বিছানায় বসিয়া জপাদি করিতে পারা যায় কি না, বিছানা (কম্বল) শুচি কি না জিজ্ঞাসা করাতে মা কতগুলি কথা বলিলেন,—

"শুচি এখন জোর ক'রে তাড়াবেও না, টেনেও আন্‌বে না। যা আসে আসুক, বেরিয়ে যাক্। আসলে যাদের মধ্যে ঐ সব সংস্কার আসে তাদের জন্য।

চিত্তশুদ্ধি না হ'লে মনশুদ্ধি হয়?

শুচিটা খারাপ নয়, শুচিবায়ুটা খারাপ।

'আমি শুদ্ধ' ভাব্‌তে ভাব্‌তে শুদ্ধ হয়।

সন্ন্যাস মন্ত্রে দেখনা 'আমি সেই' চিন্তা করতে হয়।"

মা যে কিরকম বুঝিতে পারিতেছি না। মা জীবন্মুক্ত না কি? আমি যে ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। খুব ভালও লাগে না। কেবল একঘেয়ে ভাব। স্থির ভাব। আমার মন যেন রস চায়। মন তো এখনও বড়ই চঞ্চল, বিষয়াভিমুখী। এক এক সময় বাড়ীর কথা মনে পড়ে, কি মোহ!

বৈশাখ, ১৩৪৫। দেরাদুন।

আমি রায়পুরে গিয়া থাকি। ভোলানাথের small pox হইয়াছে। মারাত্মক আক্রমণ। আমি রায়পুর হইতে মাঝে মাঝে কিশনপুরে আশ্রমে আসিয়া দেখিয়া যাই। মা দেখি যেমন তেমন, ধীর স্থির ভাবে যতটুক করার করিয়া যাইতেছেন, যতটুক বলার বলিয়া যাইতেছেন। ভোলানাথ রোগশয্যায় "মা, মা" করিয়া চীৎকার করেন। সে আকুল চীৎকার!

একদিন কিশনপুর আশ্রমে আসিলাম। আসিয়া দেখি মা, শঙ্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি কথা কহিতেছেন। তখন পর্য্যন্ত জানিনা যে পূর্ব্বরাত্রি সাড়ে দশটায় ভোলানাথ

দেহ ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহা অনুমান পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই। কি করিয়া অনুমান করিব? আসিয়া দেখি মা যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। মুখে সেই স্বাভাবিক আনন্দ প্রতিফলিত—সেই আনন্দের প্রভাব চারিপাশের ভক্তদের উপর পড়িয়াছে। সাধারণতঃ যেরূপ আলোচনা হয় সেই সব কথাবার্ত্তাই হইতেছে। পূর্ব্বদিন যে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটিয়াছে এমন বুঝিবার সাধ্য নাই। যেন কি না কি হইয়াছে।

যখন ঘটনা শুনিলাম, ভাবিলাম ধন্য মা।

দেহ ছাড়িবার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই ভোলানাথের মুখে খালি "মা, মা," ধ্বনি শুনা গিয়াছে। মা ও ঠিক্ মায়েরই মত সর্ব্বক্ষণ প্রায় তাঁহার নিকট বসা। সে সময়ে ভোলানাথের অদ্ভুত সন্তানভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শরীর ছাড়িয়া দেবার দিন ভোলানাথ মায়ের প্রসাদ লইলেন এবং মায়ের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ঠিক্ দেহ ছড়িবার সময় মা ভোলানাথের ব্রহ্মতালু স্পর্শ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, মা ভোলানাথের দেহত্যাগের ৪।৫ দিন পূর্ব্বে বড়দি (বিধুমুখী দেবী, মায়ের জাগতিক মাতা) প্রভৃতি যাঁহারা ছিলেন অনেককেই

দূরে পাঠাইয়া দিলেন। (১) শেষের দিকে মা স্বয়ং শুশ্রূষার ব্যবস্থাগুলি করিয়া দিলেন। চিকিৎসা বিষয়েও অনেক ব্যাপারে মায়ের জ্ঞান দেখিয়া ডাক্তার আশ্চর্য্য মানিয়াছিলেন। শাস্তি, যোগেশ (ব্রহ্মচারী), সদানন্দ, মাসীমা (মায়ের বোন), ভূপতি প্রভৃতি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা মায়ের নির্দ্দেশ মত কলের পুতুলের ন্যায় দিবারাত্রি সেবা করিয়া গেলেন। কাহারও কাহারও সেবা দেখিয়া বিস্ময় মানিতে হয়। মায়েও বুঝি ছেলের জন্য এতটা করে না!

মা ভোলানাথের দেহত্যাগ প্রসঙ্গে পরে বলিয়াছেন,—

"ভোলানাথ দেখ ঠিক্ কুম্ভে সন্ন্যাস লওয়ার পরই দেহত্যাগ করিল। জ্যোতীশ ও মানস-সরোবরে সন্ন্যাস লওয়ার পরই দেহ ছাড়িল। মানস-সরোবরে আমার মুখ দিয়া যে সন্ন্যাস মন্ত্র বাহির হইয়াছিল তাহা ভোলানাথকে বলিয়াছিলাম। পরে এই কুম্ভে আমি ভোলানাথকে কুম্ভের দিন কুম্ভ-যোগের সময়ে সন্ন্যাসক্রিয়া

(১) 'বড়দিকে পাঠান হইল কেন' একথায় মা বলিয়াছেন, "আমি দেখিলাম ভোলানাথ শরীর ছাড়িলে ইনি কান্নাকাটি করিয়া আশ্রমের ভাব নষ্ট করিবেন, তাই পাঠান হইল।"

করিতে বলিয়া দেই। সেই অনুসারে ভোলানাথ কুম্ভের সময়ে সন্ন্যাসের ক্রিয়া বিধিপূর্ব্বক করে। * * * * * *

একবার ভোলানাথ সন্ন্যাস লইবার ইচ্ছা করিয়া কাশীতে যায়, তখন আমাকে সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া যায়। হাতে পায়ে ধরিয়াছিল, এমন কি জটা লইয়া পায়ে ঘসিয়াছিল। আর বলিয়াছিল, "তোমার প্রতি মাতৃভাব যদিও আমার মনে দৃঢ়ভাবেই আছে তথাপি আমি কখনও তোমায় সকলের সমক্ষে মা বলিয়া ডাকি নাই, তখন সন্ন্যাস লইয়া তোমার কাছে ভিক্ষা লইব ও 'মা' বলিয়া প্রকাশ্যে ডাকিব।" শরীর ছাড়িবার সময় সেটা পূর্ণ হইল। তাই "মা, মা" বলিয়া ডাকিয়াছিল এবং আমার হাতে থাইল।"

২১শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার। 4th June' 38
রায়পুর, দেরাদূন।

আজ ভোলানাথের শরীরত্যাগ উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারা হইবে। সারাদিন নামকীর্ত্তন। সকালবেলায়ই কীর্ত্তন সুরু।

একজন ভদ্রলোক আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিতে-

ছেন। মা ঘরে যাইবার সিঁড়ির উপর চওড়া জায়গাটায় বসিয়া।

ভদ্রলোক—মা, সেদিন যে আমার গায়ত্রীজপ করতে বলেছিলেন তার কারণ কি?

মা—দেখ, তুমি পৈতেটা রেখেছ আর কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে 'তুমি কোন জাত? তুমি বলে থাক, 'আমি ব্রাহ্মণ'; সুতরাং ব্রাহ্মণের কর্মটা একটু রাখা দরকার।

তোমার ফলের দিকে তাকাবার দরকার নেই। গাছে ফল হোক্ না হোক্, তুমি রোজ একটু ক'রে জল দিয়ে যাবে। এক দিন না এক দিন তুমি উপকার বুঝবে। হয় ত ভালো ক'রে করতে ইচ্ছা হবে। রোজ একটি আধলা ক'রে জমালেও শেষে অনেক হয়।

আমার কাছে সব ছেলে নিয়ে আসত। সব বলে, "দেখ ব্রাহ্মণের ছেলে, সন্ধ্যা করে না" এই সব। আমি বলতাম, "ঠিক হয়েছে, ওদের তো দোষ নাই। তোমরা যখন ছেলেদের লেখাপড়া শিখাও, তখন ছেলেরা পরে টাকা আনবে বা উন্নতি করবে এরকম একটা ঠিক্ ক'রে লেখাপড়া

শিখাও। ওরাও বুঝ্‌তে পারে—আমরা এই কর্‌ছি এই জন্য, এই উন্নতি হবে। সেইজন্য লেখাপড়া ভালো ক'রে করে। কিন্তু বাপ্‌মায় যখন পৈতা দেয় তখন এ ক'রে কি হবে এ সব শিখায় না। তাই এরা যে করে না সেটা অতি ঠিক্‌ কথাই। বাপ্‌মার দেখিয়ে দেওয়া উচিত যেমন লেখাপড়া শিখানো জাগতিক দিক দিয়ে কর্ত্তব্য তেমন রোজ কিছু তাঁর কাজ করা, আধ্যাত্মিক কর্ম করাও কর্ত্তব্য।

মা এইরকম নানা ভাবে বুঝাইয়া শেষে বলিতেছেন,

"আমি তো তোমায় বলেছিলাম এখনও বল্‌ছি (গায়ত্রীজপ কর্‌তে)। এখন কর না কর তোমার ইচ্ছা।"

ভদ্রলোকটি ভ্রষ্টাচার, আচার মানিয়া চলিতে পারিয়া উঠিবেন না।

মা—তোমায় অন্য কোনও নিয়ম মানা চল্‌বে না। তা' তুমি যেখানে থাক গায়ত্রীটা নিত্য স্মরণ কোরো।

ভদ্রলোক চলিয়া যাইবেন, মা তাঁহাকে ফল দিয়া দিতে বলিতেছেন।

বিকালে ভাণ্ডারা শেষ হইয়া গেল। রাত্রি আসিল। মা সিঁড়ির উপর সেই স্থানটিতে বসিয়া আছেন। আমি ও ধারে মায়ের রচিত গানটি গাহিয়া আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "মা, গানটি ঠিক্ সুরে গাওয়া হয়েছে ?"

মা—হাঁ।

কাল কোনও ব্রহ্মচারীকে উপলক্ষ্য করিয়া গানটি নিজে নিজেই রচনা করিয়া গাহিতেছিলেন। গানটি এই—

আমি কারে বা এখন ডরি!
আমি বাহিয়া চলেছি তরী।
হোক্ না কেন তুফান ভারী, ডুব্‌বে না হয় তরী,
যাঁর যাত্রী তারই তরী, তার ভরসাই করি।

রাত্রে সব ধোওয়া হইয়া গেলে মা খালি পায়ে খোলা স্থানটিতে বেড়াইতেছেন। গান ধরিলেন, কী সুন্দর!

আমি কি তার সঙ্গছাড়া হই ?
যেজন কাতর প্রাণে ডাকে আমায় 'মা কই, মা কই'!

আরও গান মা গাহিতেছেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছি।

রাত্রে মন্দিরের সম্মুখস্থ ছোট্ট নাটমন্দিরে মায়ের বিছানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মা শুইয়া শুইয়া এ কথা

সেকথা বলিতে বলিতে অদ্ভুত জড়ানো আওয়াজ করিতে লাগিলেন। কতকটা "গুণগুণ" এই রকম।

শেষে শঙ্করানন্দ স্বামী ও আমি জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিতেছেন, "পুলস্ত(১) কি?"

শঙ্করানন্দ—পুলস্ত একজন ঋষি, ব্রহ্মার মানসপুত্র।

মা—আমি পুলস্ত ঋষির সঙ্গে কথা কইছিলাম?

আমি—আচ্ছা মা, আপনি কি এইগুলি খেয়াল ক'রে বল্‌লেন, না আপনা আপনি বেরুল?

মা'র যে খেয়াল ('খেয়াল' মানে যদি 'ইচ্ছা' হয়) নাই এবং যা কিছু আপনি বাহির হয়, মনের ক্রিয়া নাই—এই সব মা ও শঙ্করানন্দ দুইজনেই বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "সবই স্বাভাবিক।"

আমি কথা কাটাকাটি করিতে লাগিলাম, বলিলাম, "আমি দুরকম শ্রেণী বলি—(১) এক রকম হচ্ছে আপনা আপনি বাহির হওয়া, যেমন স্তোত্রাদি বাহির হইত, (২) আর যাহা বলাইয়া লই বলেন (মা এরূপ বলেন তাই বলিলাম।) না হয় দুটাই স্বাভাবিক হইল; এটা কোন শ্রেণীর স্বাভাবিক?"

মা কিছুতেই এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। "আমার

(১) মা যেন উচ্চারণ করিলেন 'পুলস্তর্'।

সবই স্বাভাবিক, সবই এক" এই সব বাক্যে ওজোর কহিয়া কথা উড়াইয়া দিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন,—

"ও যা বলেছে তা' ওর পক্ষে ঠিকই, কারণ বাহির হ'তে আমার কথা ইচ্ছার প্রকাশই মনে হয়—সাধারণের যা' হয়ে থাকে।"

* * * * *

কিছুক্ষণ পরে মা দুর্গাসুরের টান ধরিলেন; এবং একটু বাদে অশ্রুতপূর্ব্ব ভাষায় একটী গান গাহিতে লাগিলেন। তারপরে ভৈরবীতে গাহিতেছেন, চমৎকার! গানে ক্রমে সংস্কৃতবহুল ভাষা। (কিছু কিছু টুকিয়াও রাখা হইল)।

মা—সুরটা যেন গিয়া একেবারে লয় হয়ে গেল, শেষ স্থান স্পর্শ কর্‌ল (মা ব্রহ্মতালু দেখাইলেন) তারপরে ক্রমে নীচে কণ্ঠে এসে জিহ্বায় এল ও শেষে ওষ্ঠে এসে চুপ্‌ কর্‌ল।

ভাষা সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"এ' ভাষা (পূর্ব্বে যে হইতেছিল) জড়ানো জড়ানো শোনা গেলেও সেই ভাষার দিক্‌ দিয়া ঠিক্‌ই আছে।

এরকম আগে হোতো, হয় ত কিছু জিজ্ঞাসা

কর্‌ল আমি সেই ভাষায় উত্তর দিচ্ছি। আবার বল্‌ছে—এই কি বল্‌ছ? আবার সেই ভাষায়ই উত্তর দিচ্ছি।

ক্রমে মিশ্রিত সাধারণ ভাষায় কথা বল্‌তে রজোগুণ, তমোগুণ হ'ত। তাই যখন সবটা আসেনি তখন কথা জড়ানো থাকৃত।"

আমি—আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে অন্য সময় কখনও এই ভাষায় গান গাইতে বলি, আপনি গাইবেন?

মা—হাঁ, খেয়াল হ'লে গাইব।

* * * * *

পরদিন রবিবার রাত্রে আমি খাইয়া দাইয়া মায়ের কাছে বসিলাম। মা নাটমন্দিরে বসিয়া স্বামী শঙ্করানন্দের সহিত কথা কহিতেছিলেন। স্বামীজি একটু দূরে ছিলেন।

আমি সহসা দেখিলাম, মা'র পিছনে মোটা থাম ধরিয়া কে দাঁড়াইয়া। চাঁদের আলো পিছন দিকে ছিল তাই কালোপানা দেখাইতেছিল। দেখিয়া আসিলাম, কেহ আছে কি না। কেহ নাই। মাকে বলিলাম।

মা বলিলেন, "আমার কাছে ও রকম সব সময়েই থাকে"।(১)

মা একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমরা ঘর খালি করে দিয়ে গেলেও ঘর খালি

২০শে আশ্বিন, শুক্রবার। 7th October.
পীতকুঠী, হরিদ্বার।

পীতকুঠী গঙ্গার ধারে একখানি বাড়ী। বাড়ীটির সহিত একেবারে লাগিয়া গঙ্গা চলিয়াছেন, অপরূপ দৃশ্য! মা যে ঘরটিতে থাকেন সেটি গঙ্গার দিকে।

ভোরে মায়ের কাছে গিয়া বসিয়াছি। আমি মৌনী আছি, কিন্তু মা কথা কহিতেছেন, ভাবের আদান প্রদান চলিয়াছে।

একটু বেলা হইয়াছে। নীরোজবাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য সব ভক্ত আসিয়া বসিয়াছেন। দিল্লী হইতে উপেন্দ্রবাবু (যিনি শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে বহুকাল কাটাইয়াছেন) অন্য একটি ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। ইনি উপেন্দ্রবাবুর বন্ধু এবং শ্রীরামঠাকুরের শিষ্য।

মা একথা শুনিয়া সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"বাবা কোথায় এখন?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "তিনি এখন নোয়াখালিতে।

থাকে না। ঘরে অনেকে থাকে।" মাকে অনেক সময়ে সূক্ষ্মদেহধারীদিগের সহিত কথা কহিতে ও ভাবের আদান প্রদান করিতে দেখিয়াছি।

শরীর খারাপ। লোকের সংস্পর্শে বেশী থাকেন না।”

ক্রমে ঘরের সকলেই চুপ হইলেন। সকলেই বোধ হয় পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন। অনেকেরই চক্ষু নিমীলিত। নবাগন্তুক হঠাৎ কান্দিতেছেন। আবার মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন। একটি আধ্যাত্মিক ভাব বুঝি সকলকে সংক্রামিত করিয়াছে।

নীরোদবাবু হঠাৎ আসিয়া বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া কি মন্ত্র পড়িয়া চলিয়া গেলেন।

মা একটু বাদে তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেছেন,—

“মুখে একখণ্ড মিছ্‌রি (নাম) রাখবে। একবার এ গাল আর একবার ও গাল করবে।”

এইবার মাকে খাওয়ান হইবে। মায়ের শরীর অসুস্থ বলিয়া মাকে সকলের সাম্‌নে খাওয়ান হয় না। তাই সকলে উঠিয়া গেলেন।

লক্ষ্মীমাঈর ভগ্নী তাঁহার private কথা বলিবেন। ঘরে একমাত্র আমি। (কথা হিন্দীতে চলিতেছে)

লক্ষ্মীর ভগ্নী—মা, জপ কত ক’রে করব?

মা—**যত বেশী জপ করতে পার ততই ভাল, এতে বাজে বকাও কমে।**

লক্ষ্মীর ভগ্নী—মা, ধ্যান কি প্রকারে কর্‌ব ?

মা—তোমার কেমন ধ্যান আসে ?

*   *   *   *   *

"মা, সংসার খারাপ লাগে"—লক্ষ্মীর ভগ্নী কন্দিতেছেন।

মা—তুমি ত এখন সংসার ত্যাগ কর্‌তে পারছ্‌ না। সংসারে থেকেই তোমার যা কিছু কর্‌তে হবে। সংসারে যখন থাকতে হবে তখন ধর্ম্মের সংসার করা দরকার। সেবা-বৃত্তিতে থাক, তিনিই ত কর্মরূপে তোমার কাছে প্রকাশ পাচ্ছেন। যেমন পান খেতে খেতে কাজ কর।

এইবার কনখলে যাওয়া হইবে। বাস্ আসিল। সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দজী, বুনী, সপরিবারে নীরোজবাবু, মন্মথবাবু, উপেনবাবু, Sinha সাহেবের স্ত্রী প্রভৃতি।

Ramkrishna Mission এ যাওয়া হইল। একটি বারান্দায় চেয়ারে মাকে বসানো হইল।

স্বামীজিরা সব আসিয়াছেন। তাঁহারা খুব আনন্দিত হইয়াছেন।

মা বলিতেছেন, "বাবা, এই মেয়েটিকে নিয়ে এলে এখন"।

মাকে হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, অস্ত্রোপচারের ঘর প্রভৃতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখান হইল।

মা হাসপাতালে গিয়া রোগীদের দেখিয়া বলিতেছেন,—

"এ সব তাঁরই এক এক রূপ।"

মা একজন মহারাজকে বলিতেছেন,—

"তিনিই এ সব করাচ্ছেন।"

অস্ত্রোপচার ঘরে একটি টেবিল আছে। স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাহার কথা মাকে বলিতেছেন,

"এটা যেভাবে ইচ্ছা মোচ্‌ড়ান, ঘোরাণ, ফেরান যায়; কাটাছেঁড়ার সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা"।

মা বলিলেন, "যার যে দিকে দৃষ্টি। এই সবের একটা ছাপ তোমার মনে পড়ে রয়েছে, সেটা কি সহজে যায়?"

মা মঙ্গলানন্দগিরিজীর আশ্রমে চলিলেন। আশ্রমে ঢুকিয়াই মা বলিতেছেন, **"আছে ত? আছে ত?"**

বাস্তবিকই দেখা গেল তিনি আশ্রমে নাই, দিল্লী গিয়াছেন। একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা হইল। একখানি Group ফটো তোলা হইল।

৯ই মাঘ, সোমবার। 23rd January, '39.

'বরোদা'র একটি ধর্ম্মশালা

মা সকালবেলা ধর্ম্মশালায় দুতলার উপর বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে আছি।

স্থির, শান্ত ও গম্ভীর ভাব। 'ব্যাস'এ যখন ছিলাম মা'র সহিত কত বক্‌বক্ করিয়াছি, চুপ্ হইয়া গেলেও কথা কহাইয়াছি। কিন্তু এখন কি একটা গাম্ভীর্য্য মা'র কথা-বার্ত্তা, চলাফেরার মধ্যে অনুব্যাপ্ত রহিয়াছে যে আমি সাহস করিয়া সহজভাবে কথা কহিতে পারিতেছি না। কেমন একটা আকাশপাতাল তফাৎ, কেমন একটা সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিলাম। অথচ মা প্রশান্ত। ক্রোধ বা অন্য কিছু চাপাভাব নাই।

বারান্দায় রেলিঙ্ এর ধারে আমরা দুজনেই দাঁড়াইয়া আছি। দেখিতে পাইলাম নীচে গঙ্গাচরণবাবু অন্য এক ভদ্র-লোকের সাথে আসিতেছেন। দুইজনেই সাহেবী স্যুট্ পরা।

দু'জন উপরে আসিলেন। নবাগন্তুক ভদ্রলোক হাতে এক গুচ্ছ জবাফুল লইয়া আসিয়াছেন। আসিয়া মায়ের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছেন, মায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া। দৃষ্টিও লক্ষ্যে সপ্রশ্ন, সকৌতূহল হইয়া শেষে

শান্ত, এক অপূর্ব্ব ভাবে ভাবান্বিত ও স্তব্ধ হইয়া গেছে।

কিছু সময় এই ভাবে কাটিলে পর মণিলাল জবাফুলের গুচ্ছটি দিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। মাও হাত বাড়াইয়া লইলেন।

মায়ের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। প্রশান্ত, গম্ভীর মুখের উপর সেই দিব্য হাস্য যে কি অপূর্ব্ব, কি প্রাণস্পর্শী তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে পারি না। মা হাসিতেছেন, যেন একটি শুভ্র প্রভাতে বিস্তীর্ণ বাপীতটে দাঁড়াইয়া মৃদুপবনে আন্দোলিত জলের মনোরম তরঙ্গশোভা দেখিতেছি।

না, উপমা ঠিক্ হইল না। মা হাসিলেন, বুঝি একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল। পদ্মটি কিরূপ? না একেবারে শুভ্র। মলিনতার লেশমাত্রও উহাতে নাই। কমলদল-বিকাশও বুঝি মায়ের সেই পবিত্র হাস্যের উপমাস্থল হইতে পারে না।

পৌর্ণমাসীর চন্দ্র অতিশয় উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ, মনোরম বটে, কিন্তু সকলঙ্ক। মায়ের সহাস্য বদন নিষ্কলঙ্ক। অর্থাৎ কোনও প্রকার ভাববিকার এ পর্য্যন্ত মায়ের মুখখানিকে স্পর্শই করে নাই যাহার কালিমা লাগিয়া থাকিতে পারে।

মুখের আকৃতি, সৌন্দর্য্য এবং ভাবভঙ্গিমা সমস্তই বিশেষ বিশেষ শুভাশুভ সংস্কার হইতে আসিয়া থাকে। সংস্কার তো দাগ আঁকে, সংস্কারই কালিমা। মায়ের মুখখানিতে যে ভাব খেলে তাহা দিব্যভাব, কোনও সংস্কার হইতে আসে নাই, মায়ের মুখের আকৃতিও সংস্কারজন্য গঠিত নহে। তাই বলি মায়ের মুখচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক। মুখে শত ময়লা লাগিলেও নিষ্কলঙ্ক।

মা হাসিলেন, মনের তারে যে কম্পন চলিতেছিল তাহা যেন সহসা স্থগিত হইয়া গেল, অন্য এক প্রকারের কম্পন চলিতে লাগিল। আমাদের মত জীবের মনে মায়ের চরণ হইতে বিরুদ্ধ দিকে একটা ভাবের স্রোত স্বতঃই চলিতে থাকে। তখন সহসা সে স্রোত যেন বিপরীত দিকে বহিতে লাগিল।

মা ফুলের গুচ্ছটি লইয়া গঙ্গাচরণবাবুর হাতে দিলেন। তিনিও লইয়া মায়ের চরণে পতিত হইলেন।

মা আসিয়া বারান্দায় একস্থানে বসিলেন। অপর দুইজনও বসিলেন। সকলেই চুপ্ করিয়া আছেন। কাহারও মুখে কথা যেন আসিতেছে না। একটু পরে গঙ্গাচরণবাবু মণিলালকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। মণিলাল শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের কৃপাপাত্র, ডাক্তার।

মণিলাল—মা, আমার এ জন্মে ঈশ্বরকে অপরোক্ষানুভূতি করা হবে কি না?

মা—(সহাস্যে) **গুরুর আশ্রয় মিলেছে?**

মণিলাল—হাঁ।

মা—**তিনি কি বলেছেন?**

মণিলাল—তিনি ত আশা দিয়েছেন।

মা—**তা'হলে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন?**

নানাকথা চলিতে লাগিল। শ্রীঅরবিন্দ ব্যাঘ্রচর্মের উপর কি ভাবে পড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে পা ভাঙ্গিয়া যায়। এখন সুস্থ হইতেছেন। এ'সব কথা হইতেছে। * *

বিকালবেলা। মণিলাল ও তাঁহার কন্যা আসিয়াছেন। গঙ্গাচরণবাবু পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। মায়ের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত অমৃতবাণীর ধারায় শুষ্ক হৃদয় সিক্ত, সঞ্জীবিত হইতেছে।

গঙ্গাচরণবাবুর বাড়ীর দুটি মেয়ে গান গাহিতেছে,—

হরি তোমায় ছেড়ে জীবন ধরে
রইব কেমন করে?
তুমি ধন দিয়েছ, মান দিয়েছ,
প্রাণ নিয়েছ কেড়ে।
(আমার কি কাজ ধনে তোমায় বিনে)

যখন ভাবে গ'লে ডাকি হা কৃষ্ণ বলে
তুমি অম্‌নি এস হেলে দুলে
ভবসাগরের তীরে।
(তোমার কালোরূপে আলো ক'রে)

[মায়ের হিন্দী কথাগুলি প্রায়ই বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।]

মা মণিলালের কন্যাকে গান গাহিতে বলিলেন। মিষ্টি গলায় সে একটি হিন্দী ভজনগান গাহিল।

মা—**অভ্যাসযোগ গীতায় আছে। অভ্যাসযোগ দ্বারা ক্রমে সদ্‌ভাব অভ্যস্ত হ'য়ে যায়। ভুলকো ভুল হো যায় তব্‌ তো ঠিক্‌ হায়!**

মা—(মণিলালের কন্যার প্রতি) **তোমার নাম কি?**

কন্যা—চন্দনবালা।

মা—**চন্দন কি কাজে লাগে?**

কন্যা—ভগবানের পূজায় লাগে।

মা—**তুমি এরকম চন্দন, ভগবানের পূজায় লাগে?**

মা—(গঙ্গাচরণবাবু ও মণিলালের প্রতি) **এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সদ্‌ভাবের সঙ্গ**

দেওয়া উচিত। কেন না এই বয়স হ'তে সৎসঙ্গ, সদ্‌ভাবের মধ্যে থাকৃলে ক্রমে ঐ দিকেই যেতে থাকৃবে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া বাপ্‌মায়েরই কাজ।

এরকম শিক্ষা চাই, এই যে সংসারের ভোগ এতে তৃপ্তি নাই, মহারাজ হ'লেও তৃপ্তি নাই।

ছোট ছেলেমেয়েকে আমি পাঁচটা কর্তব্য কর্‌তে ব'লে দেই।

(১) ভগবানের কাছে একটু প্রার্থনা কর।

(২) মা বাপের কথা মান।

(৩) পড়াশুনা কর।

(৪) সত্যকথা বল।

(৫) তারপরে শয়তানি কর্‌তে পার।

(মণিলালের কন্যার প্রতি) বল ত কি কি করা উচিত? সে বলিল।

গঙ্গাচরণবাবু—আমাদের কিছু বলুন। ছোটদের কথা ত বল্লেন।

মা—তোমরা এত চাকুরী কর্‌ছ, একস্থানে থাকৃতে হচ্ছে, নিয়মিত কাজ কর্‌তে হচ্ছে, এ ভাবে মাসে মাসে মাহিনা পাও আর নির্দিষ্ট সময় অতীত

হয়ে গেলে পেন্‌সন্‌ মিলে। এরকম ভাবে তাঁর কাজ কর্‌লেও পেন্‌সন্‌ মিলে।

কৃপা অনুভবের জন্য নিজের উপরে কৃপা কর। কত কথাই তো আমরা শুনি। কথা শুনা হচ্ছে কোথায়? যখন কার্য্যে প্রকাশ হবে তখনই ঠিক্‌ ঠিক্‌ কথা শুনা হ'ল।

এক খেয়াল লক্ষ্য করে চল।

সৎসঙ্গ কর্‌তে হয় কারণ সৎসঙ্গের একটা প্রভাব আছে, সেটা অনুভব করা যাক্‌ আর না যাক্‌।

রৌদ্রে ঘুরে গাছের ছায়ায় বস্‌লে তার প্রভাব পড়্‌বেই; ঠাণ্ডা লাগবে। তবে মনে কোনও দুশ্চিন্তা থাকলে হয়ত সে প্রভাব সে বুঝ্‌তেই পারবে না।

আমাদের নিজেদের কিছু করতে হবে। সাম্‌নে খাবার, মুখে তুলে দিতে হবে অন্ততঃ।

জনৈক ভক্তস্ত্রীলোক—মা, যার নিজের কোনও শক্তি নাই সে কি কর্‌বে?

মা—এই যে বল্‌লে, 'যার কোনও শক্তি নেই সে কি কর্‌বে?'—এই বল্‌বার শক্তি কোথা থেকে হ'ল? এ শক্তিতেই জপ বা ভজন কর্‌তে পার ত?

রাত্রে এক সাধু অনেকগুলি শিষ্য সহ আসিলেন। শুনা যায় তিনি নাকি আড়ম্বর করিয়া বেড়ান মাত্র।

মা তাহাকে **"কতক্ষণ ভজন কর?"** ইত্যাদি কহিয়া এমন জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন যে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন।

১৬ই ফাল্গুন (১৩৪৫) মঙ্গলবার। 28. 2. '39.
নির্বাণ মঠ ও বালানন্দ আশ্রম। দেওঘর।

* * * * * *

মা নির্বাণ মঠে আছেন। বিকাল হইয়াছে। মাকে মোটরে করিয়া বালানন্দ আশ্রমে লইয়া যাইবার কথা। মা, ভ্রমর, আমি ও অন্য এক স্বামীজী চলিলাম।

গিয়া দেখি মা যাইবেন বলিয়া আশ্রমের বারান্দায় বসিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গুরুর একটি আসন আছে, তাহার পাশে মায়ের জন্য আসন বিছান আছে। প্রাণগোপাল বাবু, মোহনানন্দজী প্রভৃতি আনন্দে মায়ের সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে গৃহী ও সাধু অনেক ভক্ত আসিয়া বসিলেন। সকলে উৎসুক আছেন, মায়ের অমৃতবাণী শুনিবেন। 'মহাতাপস' নামক পুস্তকের

রচয়িত্রী হেমলতা দেবী অগ্রসর হইয়া মায়ের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

মাকে অনেকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মাও সুন্দর সুন্দর জবাব দিতে লাগিলেন। যতটা স্মরণ হয় লিখিয়া রাখিতেছি।

মা—সেই একেরই অনন্ত ভাব, রূপ।

মোহনানন্দজী—একই যদি হয় তবে অনন্ত হয় কি ক'রে? এক হ'লে বহু কি ক'রে হয় তা' বুঝ্‌তে পারি না।

মা—বুঝ্‌তে পার্‌বার জন্যই ত এই বেশভূষা নিয়েছ, এই পথে চলেছ। সেটা মুখে বুঝান যায় না। আমাদের দুই বুদ্ধি রয়েছে কি না; এই বুদ্ধি দিয়ে যতই তাকে ধর্‌তে যাব, বুঝ্‌তে যাব ততই ঘুরিয়ে নিয়ে আস্‌বে।

মোহনানন্দজী—তাহ'লে ভগবান্ দুই চক্ষু দিলেন কেন?

প্রাণগোপাল বাবু ঐ কথার উত্তর দিলেন। বলিলেন, "দুই চক্ষু রয়েছে বটে, কিন্তু দুই চক্ষু দুইটা দেখে না, একটা দেখে।"

মা সদা হাস্যময়ী। হাসি মুখে, কখনও বা হা হা করিয়া হাস্য লহরী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া সমাগত ভক্তজনমনে অনুরূপ তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া, মধুর ভাবে

কথা বলিতেছেন। সকলেই উদগ্র হইয়া রহিয়াছেন মা কি বলেন। সকলেরই এক লক্ষ্য, এক দৃষ্টি।

মা—**হাঁ, চক্ষু দুইটি হ'লেও দেখে এক।**

আর দেখ, এক পা এক পা ক'রে চলে, এক গ্রাস এক গ্রাস ক'রে খায়, সব সময়েই এক রয়েছে।

মোহনানন্দজী—মা, দুই চক্ষুতে এক দেখে সত্য, কিন্তু চক্ষুটা টিপে ধর্‌লে দুইটা ছবি দেখা যায়।

মা—**একের মধ্যেই অনন্ত ভাব বলা হ'ল না?**

আর দেখ আমরা বহুর মধ্যে রয়েছি বটে, কিন্তু ভিতরে সেই জিনিষ রয়েছে। এর মধ্যে থেকেও আমরা সেই অখণ্ড ভাবের সাড়া পাই। মন দেখ না, খণ্ড আনন্দ নিয়ে তো তৃপ্ত থাকতে পারে কিন্তু তা ত থাকে না। সর্ব্বদাই সে অখণ্ড আনন্দ চায়। একবারে তো বাদ দেওয়া নাই। এর মধ্যেই আমরা যে অখণ্ড তা বেশ বুঝা যায়।

বাহিরের কর্মে অভাবের নিবৃত্তি হয় না। এসব যে অভাবের কর্ম। অভাবের কর্মের স্বভাবই এই যে সদা সর্ব্বদা অভাব জাগ্রত

ক'রে রাখে। তাই স্বভাবের কর্ম করতে হয়। এমন বন্ধন নিতে হয় যাতে সর্ব বন্ধন নষ্ট হয়। বাহিরের দৃষ্টি, বাহিরের ভাব কমিয়ে দিয়ে অন্তর্মুখী হয়ে যেতে হয়।

মোহনানন্দজী—বাহিরে কি তিনি নেই ? বাহিরটাকে বাদ দিলে হবে কেন ? অন্তরে তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা না করে বাহিরে তাঁকে পেতে চেষ্টা করা কি উচিত নয় ?

মা—প্রথমে ভিতরে ঢুকে তাঁর ভাব নিয়ে থাকবার চেষ্টা করতে থাকলে এমন সময় আসে যখন শুধু ভিতরে নয়, বাহির ভিতরে সেই ভাব এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আর বাস্তবিক বাহির ভিতর ব'লে কোনও কথাই ত নেই।

কি কথায় মোহনানন্দজী মাকে বলিলেন, "আপনি ত পূর্ণ!"

মা বলিলেন, "পূর্ণ, তা কি তোমায় বাদ দিয়ে ?"

জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে মা বলিতেছেন,—

"জীব এই যে সৎকর্ম, অসৎকর্ম করে এর কারণ—এইরূপ করাই জীবের স্বভাব।

আমাদের উচিত ইচ্ছাশক্তি সাহায্যে তাঁকে

পাবার জন্য লেগে যাওয়া। আমাদের ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, ইচ্ছা ক'রে সব কাজ কর্‌তে পারা যাচ্ছে, এর বেলা যদি বলি, তিনি কেন করান না? সেটা ঠিক্ নয় কি না। ইচ্ছা দ্বারা ঠেলেঠুলে কোনও রকমে গিয়ে একবার স্রোতে পড়্‌তে পার্‌লেই হ'ল। আর চিন্তা নেই, আপনা আপনি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।"

জনৈক বৃদ্ধ এক পাশে বসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, অহমিকা যায় কিসে?"

মা বলিলেন, "যতক্ষণ পর্য্যন্ত জগতের মধ্যে থাকা অহমিকা যেতে চায় না। তাই অহমিকাকে ঐ দিকে লাগাতে হয়। 'আমি তাঁর চিন্তা কর্‌ব, আমি তাঁর নাম কর্‌ব' এই ভাব রাখ্‌তে হয়।

হয় 'আমি আমি' কর্‌তে হয়, তুমি চলে যায়, আর না হয় 'তুমি তুমি' কর্‌তে হয়, এতে আমি চলে যায়। একটা নিয়ে থাক্‌তে হয়।"

মোহনানন্দজী গান ধরিলেন। চমৎকার গান। যেমন গলার স্বর, তেমন ভাব! বাস্তবিকই সে গানে প্রাণকে মাতাইয়া তোলে।

কীর্ত্তনাদির পরে মা নির্ব্বাণ মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রে মা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন, আর ভ্রমর ঠাকুর ঘরে বসিয়া গান গাহিতেছেন। মা বলিলেন,—

"জ্যোতীশ ভ্রমরকে দিয়ে বার বার এই গানটা করাতো।"

অনন্ত অপার তোমার কে জানে,
তুমি দেখা না দিলে প্রাণে, ধ্যানে, জ্ঞানে!
বাক্যমনাতীত তুমি অনাদি,
সম্ভব, প্রলয়, পালন বিধি;
প্রাণরূপী ব্রহ্ম, আছ প্রাণে।
অজর, অমর, চিন্ময়, সুন্দর,
নিত্য নিরঞ্জন, পাবন হে;
অরূপ, অব্যয়, এক, অদ্বিতীয়,
দিব্য, জ্যোতিঃধর, অমৃত আকর;
তোমার তুলনা প্রভু তুমি হে।

গানটি খুবই ভালো লাগিল।······কলিকাতায় ভ্রমর একবার এই গানটি গাহিয়াছিলেন প্যাণ্ডেলের নীচে, অনেক লোকের মধ্যে, মায়ের কাছে। তখনই গানের গম্ভীর ভাব আমাকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিল।

১০ই চৈত্র (১৩৪৫) শুক্রবার। **24. 3.'39.**

দিল্লী আশ্রম।

বেলা আন্দাজ ৩টা হইবে। মেয়েরা সব আসিয়া মাকে পাইয়া বসিয়াছেন। মাও আনন্দে কথা কহিতেছেন। মুখে হাস্য। সে মিষ্ট হাস্য যেন সকলের মনকে আকর্ষণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য একটা আনন্দে ভরপূর করিয়া রাখিয়াছে।

Dr. J. K. Sen এর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "গুরু না কর্‌লেও হয় ?"

মা—**লেখাপড়া আপনি করা যায় কিন্তু মাষ্টার যখন তন্ন তন্ন ক'রে দেখান তখন ঠিক্ হয়।**

বাজে নামে মন খারাপ হয়, মনে অশান্তি আসে, সেই হিসাবে ভগবানের যে কোনও নাম নিলে মনে শান্তি আসে এ কথা ঠিক্। বীজ পাচ্ছি না, জমী ত পরিষ্কার কর্‌ছি। সেইজন্য ভগবানের নাম যেমনে তেমনে নিলেও উপকার আছে।

ঐ ভক্ত—গুরুকে ভগবান্ বল্‌তে বলে কেন ?

মা—**তিনি তাই-ই ত! তাই বলে। এক ভগবানই ত গুরু।**

ঐ ভক্ত—আচ্ছা, গুরু ত ভগবান, তা হ'লে যে দীক্ষা দেয় তাঁকে ভগবান বলে কেন?

মা—তাঁর তত্ত্ব একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেহ প্রকাশ করতে পারে না। একমাত্র ত তিনিই। সেইজন্যই যখন গুরু বল্‌ছি, মানুষবুদ্ধি রাখ্‌তে নেই, ঈশ্বরবুদ্ধি রাখ্‌তে হয়। পাথর বল্‌লে শিব বলা হয় না, আবার শিব বল্‌লে পাথর বলা হয় না। আবরণ পড়ে রয়েছে তাই দেখা যায় না। এ আবরণ কাটে গুরুশক্তিতে, গুরুর দয়াতে।

কে তাহার মামা (কিংবা মামী) সম্বন্ধে কি বলিতেছে।

মা—এই যে মামা মামী এ সব শ্বাস প্রশ্বাসের সম্বন্ধ। ঘরও শ্বাসপ্রশ্বাসের ঘর, আর সম্বন্ধও তাই। শ্বাস চলে গেলে কে মামা, কে মামী! সবই ফাঁকা। এ থাকবার জিনিষ নয়, কিছুই থাকে না। যেমন সূর্য্য উদয় হ'ল, সন্ধ্যা হ'ল, রাত্রি হ'ল; ঐ রকম পর পর পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। গাড়ীতে বসে আছ, ভাব্‌ছ যেমন তেমনি আছ, কিন্তু অনেক চলে আস্‌ছ।

নিজের নিজের পথ দেখ, আপনা আপনা পথ

দেখ। আপনা ঘরের খবর করা চাই। সেখানে স্ত্রী নেই, পুরুষ নেই।

এক ভক্ত—তিনি সব খেলনা দিয়ে রেখেছেন।

মা—খেলনা ত মা অনেক রকম আছে। তিনি কত রকমে খেলে গেছেন। সেই লীলা, সেই খেলা চিন্তা কর। সেই খেলা নাও যে খেলা নিলে এটা যে খেলা তা' ধরা পড়ে।

"হচ্ছে না, হবে না" বলে গা ঢালা দিয়ে থাকতে নাই। যে দিন যায় আর ফিরে আসে না। একটি একটি মিনিট করে সময় যাচ্ছে।

খেলার ভিতর দিয়ে খেলা ভাঙ্‌তে হয়। যে খেলার ভিতর দিয়ে খেলা ভাঙে সেই খেলা নিতে হয়। তোমরা সব ময়লা উঠাতে সাবান দাও তো? সাবানটাও তো ময়লাই। তবে সাবানটা ঘ'সে তারপরে জল দিয়ে তুলে ফেল্‌তে হয়। যেমন একটা কিছু দিয়ে বাসন মাজ্‌তে হয়। শরীরটাও তো বাসনই।

ঠাকুরের নাম হ'ল তেঁতুল। যতই নাম কর চিত্তশুদ্ধ হবে। তেঁতুল দিলে ময়লা উঠে যায়। বাসন পরিষ্কার হ'লে তা'তে পরিষ্কার দেখা যায়।

নাম করা হচ্ছে মাজা। মেজে স্বরূপ দেখতে পার। এই জ্ঞান এল। জ্ঞান-গঙ্গা এসে ধুয়ে দেন। কর্ম টর্ম যা' কিছু সব ধুয়ে যায়।

জাগতিকের মধ্যে যা' দেখতে পাওয়া যায় তা'ই রয়েছে। (অর্থাৎ জগৎতত্ত্ব পরমার্থতত্ত্বই বলিতেছে)।

এক ভক্ত কথায় কথায় বলিলেন, "মন্দ কি?"

মা—মন্দ কোথায়? সবই ভাল। তবে আমাদের মন্দ ভাব, মন্দ দৃষ্টিই মন্দ। আবার এক জায়গায় গেলে ভাল কথাটাও দাঁড়ায় না, মন্দ কথাটাও দাঁড়ায় না।

কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছেন,

"নাম করাই সৎসঙ্গ। পাঠ, জপ, কীর্ত্তন, চর্চ্চা সবই সৎসঙ্গের মধ্যে। নামের মধ্যেই সব কিছু আছে। নাম কর্‌তে কর্‌তে সব কিছু এসে যায়।

আলুনি আলুনি পড়্‌লে ভাল লাগে না ত? মশ্‌লা পড়্‌লে রস লাগে, না? বলে, 'বড্ড বেশী খেয়ে ফেলেছি, এত ভাল লেগেছে!' এ রকম হওয়া চাই। ভক্তিশ্রদ্ধা না হলে রস হয় না।

ভক্ত—কত বাধা বিঘ্ন আসে, কি করি?

মা—বাধা বিঘ্ন কত কি করে রেখেছি আমরা! নূতন করে? আমরাই বাধা বেন্ধে রেখেছি। খেয়াল রাখ্‌তে হয়, 'আসুক বাধা আসুক, টল্‌ব না'। দেহত্ব বুদ্ধিটা মা, না গেলে কিছুরই প্রকাশ হবে না।

তার উপর যখন মন যায় তখন দেহের কিছু লাগে না। দেহে মন না থাকলে তিনি কাছে, যতই দেহের উপর মন যায় ততই তিনি দূরে। দেহের ভোগও কর্‌ব, ভগবানও আসুক এ কি ক'রে হয়?

তিনিই সেজে আছেন বটে কিন্তু বোধ নেই। খেলা! খেলা বোধ কর্‌বার জন্যই ঐ সব খেলা নিতে হয়—পূজা, পাঠ, চর্চ্চা ইত্যাদি।

সর্বদা মনে রাখ্‌বে 'হচ্ছে না'—আমার ত্রুটী। তিনি ত ছড়িয়ে রয়েছেন। আমাকে জয় কর্‌তে হ'লে 'আমি' দিয়েই আমাকে জয় কর্‌তে হয়, 'আমি'র উপর জোর দিবে। 'আমি তাঁকে ডাক্‌ব, পূজা কর্‌ব'।

কথা শুন্‌লাম আর চলে গেল, এতে হয় না। একটি (কথা) আমরা শুন্‌ব তাহ'লে এককে

পাব। কতই ত বই পুস্তকে পাই। একটি বেছে নিয়ে সংকল্প করতে হয়। ধর্মগ্রন্থাদি পাঠটাঠ করতে হয়, শুন্‌তে হয়। মনের গতি ত সব সময় এক রকম থাকে না; কোন সময় কোন স্তরে যায় যখন ধরবার শক্তি হয়। কোন সময় কোনটা লেগে যায় তার ঠিক নাই।

আমরা সত্যতে, ভালোতে. বড়তে রয়েছি।

এইবার মা সাপের গল্প করিতেছেন। মা বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে পথে সাপ দেখিয়াছিলেন। সকলে সাপের উপর দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু আশ্চর্য্য কেহ মাড়াইল না। মা হাসিয়া হাসিয়া এমন ভাবে গল্পটি করিতেছেন যে তাহা সকলে হৃদয়ের সহিত আনন্দে শুনিতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "শোন্ শোন্, মায়ের কথা শোন্।"

বিকালবেলা মাকে দুর্গাদাসবাবুর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। দুর্গাদাসবাবুর অসুখ, তিনি আসিতে পারিতেছেন না। মোটর বাড়ীর সাম্‌নে খাড়া হইল। দুর্গাদাসবাবু বাহিরে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। ইনি এক বিচিত্র স্বভাবের লোক। হয় ত বলিতেছেন, "মা, পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ কর।" তা' এমন ভাবে বলিবেন—দূর হইতে শুনিলে মনে হয় মাকে কেহ ধমক

দিতেছে। ভাষায় ও ভাবে তিনি মায়ের সহিত রীতিমত ঝগ্‌ড়া করেন।

মাকে তিনি বলিলেন, "মা, বাবাকে দেখ্‌তে এসছ, মেয়ের একটু মিছ্‌রী নিয়ে আস্‌তে নেই?"

মা—**মিছ্‌রী তোমার মুখেই আছে।**

দুর্গাদাসবাবু—মুখে আছে ত?

মা—হাঁ, তা' **আছে বটে, তবে কথা কইলে প'ড়ে যায়। চুপ্‌ ক'রে থাকুলে মিছ্‌রী মুখ থেকে প'ড়ে যায় না।**

মা বিদায় লইলেন। সনাতন ধর্মমন্দিরের সম্মুখে গাড়ী থামানো হইল। মা গাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। আমি ও খুকুনীদিদি দেখিতে গেলাম। এত সুন্দর সাজানো রহিয়াছে দেখিয়া বড়ই ভালো লাগিল।

এদিকে হ'য়েছে কি বিড়লা সাহেব, যিনি এই মন্দির করিয়াছেন, তাঁর ড্রাইভার মাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। কলিকাতায় বিড়লার শিবমন্দিরে বিড়লা সাহেব যখন মাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, ইনি মাকে তখন দেখেন। ড্রাইভার আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনি কল্‌কাতায় বিড়লার মন্দিরে গেছেন? একজন মৌনী বাবা (ভোলানাথ) ছিলেন।" মায়ের কথায় শেষে

চিনিতে পারিলেন। মাকে নিয়া মন্দির দর্শন করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ এক জোড়া নূতন খড়ম আনিয়া মাকে লইয়া গেলেন, কারণ মায়ের পায়ে চটী জুতা ছিল।

আমরা মাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সব দেখাইলাম। মা বলিলেন, "**বেশ সুন্দর !**"

কত সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙ্গান রহিয়াছে। উপনিষদ্, গীতার বাণী, মহাপুরুষদের দোঁহা দেওয়ালের গায়ে খোদা আছে।

বিড়লা সাহেব আসিলে মা বলিলেন,

"**এই যে সব করেছ, বেশ্ ভালই করেছ।**"

বিড়লাসাহেব—আমি কি করেছি? কিছুই করি নাই। বাইরে করেছি, ভিতরে কিছুই নাই।

মা—**হাঁ, ঠিক্ কথা। তুমি কর নাই, তিনি করিয়েছেন।**

মাকে এইবার কালীবাড়ী লইয়া লইয়া যাওয়া হইল। পাথরের মন্দিরটি মা ঘুরিয়া দেখিলেন।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৬) 14th May.

আমরা সকালবেলা গঙ্গোত্রী হইতে রওনা হইলাম। দুপরে ভৈরবঘাটে আহারাদি সারিয়া চলিলাম। 'ধরালুতে' বিশ্রাম করিয়া দুই মাইল দূরে 'হরশিলা'তে আসিয়া অদ্যকার মত বিশ্রাম লইলাম।

রাত্রে আহারাদির পর আমি মাকে বলিলাম, "আমার একান্তে কথা আছে।" একটি শিবমন্দির আছে। সেখানে মা ও আমি ঈষৎ অন্ধকারে বসিয়া কথা কহিতে লাগিলাম।

* * * * * *

মা—যেরকম বল্‌ছি সেরকম করে কর্‌বি।

আমি—আমি পার্‌ব না। দেখতে পাচ্ছি আপনার দ্বারা আমার কোনও উপকারই হয় নি।

মা কেমন যেন চুপ হইয়া গেলেন। মনের ক্ষোভে মাকে ঐ সকল কথা বলিলাম বটে, কিন্তু মায়ের চুপ্‌ ভাব দেখিয়া মনে বড়ই অনুতাপ আসিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া মা অলৌকিক ভাষায় স্তোত্রাদি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেখি গদ্‌গদ-ভাবে বলিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে কান্দিতেছেন। হঠাৎ

কান্না দেখিয়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, আপনি কি আমার কথায় মনে কষ্ট পেয়ে কাঁদ্‌ছেন ?"

মা কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন "না।"

তারপরে দেখি হাতজোড় করিয়া বিভোর হইয়া বলিয়া যাইতেছেন। বুঝিলাম প্রেমের ভাব।

কিছুক্ষণ পরেই ঊর্দ্ধ দিকে তাকাইয়া, সহাস্য বদন। ঠিক্ কান্নার পরেই হাসি, এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। বুঝিলাম এ দুঃখের কান্নাও নয়, সুখের হাসিও নয়। এক প্রেম-ভাবেরই দুই প্রকার স্ফুরণ। কান্দিবার সময় গদ্‌গদকণ্ঠে স্তোত্রাদি উচ্চারিত হইতেছিল, সে মাধুর্য্য এক প্রকার। এখন অপূর্ব্ব হাসির সহিত মিশ্রিত হইয়া স্তোত্রাদি স্ফুরিত হইতেছে, এবং অন্য প্রকার মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতেছে। যেন একই সঙ্গীত দুই সুরে, দুই তালে গাহিতেছে।

মায়ের মুখখানি চোখের জলে, মুখামৃতে আপ্লুত হইয়া পড়ায় মন্ত্রোচ্চারণ কালে দুই একটি ছিটা আমার মুখে আসিয়া লাগিল। যেন স্থির অতলজলের তল হইতে সহসা রহস্যময় প্রেমের বুদ্‌বুদ্ উঠিয়া আসিতেছে এবং আপনাকে বিকশিত করিয়া দিতেছে।

হঠাৎ চুপ করিলেন। ভাবটি যেমন তেমনই রহিল। অনেকক্ষণ চুপ, কোথায় যেন ডুবিয়া গেছেন।

ডাকিলাম, "মা!" উত্তর নাই। আবার ডাকিলাম, উত্তর নাই। আবার ডাকিলাম, "মা, মা, ওমা!"

মা যেন সচেতন হইলেন, "**অ্যাঁ**!"

বলিয়াই কোথায় যেন ডুবিয়া গেলেন। আবার ডাকিলাম, সাড়া নাই। আবার ডাকাডাকির পর বলিলেন,

"**অ্যাঁ**"।

বলিলাম, "চলুন, শুতে চলুন।" কথা যে কানে প্রবেশ করিল এরূপ মনে হইল না।

আমি—(গায়ে হাত দিয়া) মা।

মা—**উঁ**

কথা আসিতেছে না, কিন্তু বিরক্তি নাই। যতবার ডাকিতেছি প্রত্যেকবার সাড়া দিতেছেন, "**উঁ উঁ**।"

কী করুণ স্বর! করুণা, স্নেহ, মমতা, প্রেম সব মিশ্রিত হইয়া গলিয়া "উঁ" শব্দটিতে মাখানো। মা এক এক বার বলিতেছেন "উঁ," যেন একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য উহা হইতে ঝরিতেছে। সে মাধুর্য্য বর্ণনের আমার সাধ্য নাই।

এটুকু বলিতে পারি, আমার হৃদয়ে যদি এক বিন্দু

ভক্তি বা প্রেম থাকিত ঐ মাধুর্য্যের সায়র আমার ভাসাইয়া লইয়া যাইত, ঠাঁই পাইতাম না।

মায়ের মুখের উপর আলো ফেলিয়া দেখি, চক্ষু মুদ্রিত। মাকে জাগাইবার জন্য বলিলাম, "মা, চোখ খুলুন না।"

মা চক্ষু খুলিলেন। ঈষৎ আরক্তিম সজল নয়ন, তারা দুইটি এজগতের কিছুই দেখিতেছে না, কোথায় যেন ডুবিয়া যাইতেছে। সেখানে এ জগতের কোনও কথা বা খবর পৌঁছে না। ভাবের গভীরতায় মুখমণ্ডলে এক অপরূপ ভাব।

ক্রমে যেন ভাব হাল্‌কা হইয়া আসিতেছে।

* * *

মা আপনার ভাবে থাকিয়াই চক্ষু বুজিয়াই করুণ স্বরে কথার উত্তর দিতেছেন।

বলিলেন, **"হিসাব কি আমি দেই ?"**

* * *

আমি—এখন ক'রে দিন না।

মা—**সময়ে হবে।**

একটু অভিমান আসিল, বলিলাম, "মা, আপনি শুতে যান, আমি আজ এখানেই থাক্‌ব।"

মা—**তুইও ওখানেই শুবি চল্‌।**

আমি—আমি যাব না।

মা—**চল্**।

আপনার ঘোর এখনও ভাঙে নাই। তাই কিয়ৎক্ষণ থামিয়া থামিয়া আদর মিশ্রিত অনুনয়ের সুরে "**চল্, চল্**" বলিতে লাগিলেন। আমি 'যাব না' বলিতেছি, মা তথাপি "**চল্ চল্**" এরূপ বলিয়াই যাইতেছেন।

শেষে কমলাকান্ত ডাকিতে আসিলেন। মা চলিয়া গেলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গিয়া মা'র কাছেই শুইলাম।

জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৬) মাসের মাঝামাঝি মা উত্তরকাশী ছিলেন। আমি মার কাছ হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। মা দুই চার দিনের মধ্যেই কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া দেরাদূন চলিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় থাকা কালীন মাকে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়াছি। মা প্রায় প্রত্যেকখানিরই উত্তর কমলাকান্তকে দিয়া লিখাইয়াছেন। উত্তরগুলি পাইয়া বড়ই আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

একদিন মনে আছে বিড়লার শিবালয়ে নাটমন্দিরে পায়চারি করিতেছি, মনে বড়ই হতাশা আসিল। মনের বেদনা একটি কবিতার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিলাম।

"একটি কথা সুধাই আমি বারে বারে
যারে তারে,
আমার প্রাণের কথা জানাই আমি কারে ?
আমার এ দুখের বোঝা বইতে নারি,
বুকের শিরা যায় যে ছিঁড়ে, বড়ই ভারী।
একলা আমি, আর কেহ নাই !
হু হু করে প্রাণ ;
আছে কি কেউ, ওরে আছে কি কেউ
আমার ভগবান ?
আমার প্রাণের পারে যে শূন্য আছে
অতল ছোঁওয়া,
সেখানেতে দুচার ফোঁটা অশ্রু পড়ে
গালের ময়লা ধোওয়া।
শূন্য দেখেও কল্পনা আসে যদি হোতো
মনের মতো
দুখানি চরণ,
তপ্ত অশ্রু পড়্‌ত তাহার পরে,
পার্‌ত কি সে অচঞ্চল চরণ লয়ে
পাথর হ'য়ে
থাকিতে বসিয়া,

অথবা (তার) বুকের ভিতর সাড়া পড়ে ?
পেয়ে শুভ্র চরণ পরে গরম ফোঁটা
সে কি ওগো সরিয়ে নিলে চরণ দুখানি
পাছে লাগে পায়ের পরে ময়লাছিটা ?
তাই কি হ'ল ? তাই কি চরণ নিলে টানি ?

না, না, নানা, হয়নি তাহা
তাই কি হয় ? হয়নি আহা !
বলুক্ গে মন যাহা তাহা।
তাই হ'লে যে নাই কিছু হায়,
ব্যথাই ব্যথা এই দুনিয়ায় !
বুক ফেটে যায় !

একি ভ্রান্তি এ আমারি,
আপন মনকে নয়ন ঠারি !
পাইনে কেন সাড়া ?
শূন্য যদি পূর্ণ থাকে পাইনে কেন সাড়া ?
মধুর বঁধূ বাজায় বাঁশী সে কি আমায় ছাড়া ?

তা' হ'লে মোর কেহ কি নাই ?
পতিত বলে কেহ কি নাই ?

একা আমি? তাই কি, তাই?
কেউ কি আছে আমার ভগবান,
কে আছে আশ্রয়?
এ কি শুধুই ডাকাডাকি, কেউ কি আমার নয়?

তারপরে উত্তর পাইলাম। কমলাকান্ত আমাকে লিখিতেছেন, "মা খেয়ে দেয়ে শুয়ে শুয়ে মিনিট দশ পনরর মধ্যে যাহা বল্লেন অবিকল তাই লিখে দেওয়া হইল। মা বল্লেন, **"আবোল তাবোল যা আমার ভাষা!"**

পূর্ণরাজ্যে শূন্য দেখলেও লীলার তালে এই যে দেখা, এই যে রূপ, এই যে ভাব, এই যে সুন্দর। ভাষার, ভাবের সৌন্দর্য্য কেবল তোর।

একেরই রূপ একেরই অরূপ। ভগবান নাই? আছে কি আর কিছু? চরণ স্মরণ (বা শরণ) যেখানে পাথরও চঞ্চল সেখানে। হু হু ভাবে সাড়াটি ত তারই কারণ, যাঁর চরণ।

তাঁরই এ গরম ফোঁটা, সরিয়ে আর নিবে কোথা? আশার ভাবের বাসা বেঁধে চল্‌তেই হবে

খেলার তালে। নিরাশার ধারা কভু মনের কোণে স্থান দিবে না।

ওরে পাগ্‌লা গোপাল! নাই যে আমায় ছাড়া! এই যে সাড়া, সেটি সর্বক্ষণ রাখ্‌বে ধারা, তবেই ক্রমে পড়্‌বে ধরা—ঐ যে পরাৎপরা—ভগা, সেই যে একই; গুণ নির্গুণ, সাকার নিরাকারা।

ঐ যে মধুর তান, আমারই তান, আমারই এ ফাঁদ—সেই যে নিত্য, আছেন এক ভগবান্ এক ভগবান্!!

৭ই বা ৮ই ভাদ্র হইবে (১৩৪৬)

খেওড়া আশ্রম।

বিকাল বেলা। মা সাম্‌নের ছোট ময়দানের মাঝ্‌খানে বসিয়াছেন। কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। একজন অগ্রবর্তী হইয়া মায়ের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, অপর সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

মা—বাবা, কোথা থেকে এলে ?

ব্রাহ্মণ—এক জায়গায় আপৎশান্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন ক'রে এলাম।

মা অজ্ঞবৎ প্রশ্ন করিতেছেন, "**বাবা ! এ সবে কি কাজ হয় ?**"

ব্রাহ্মণ—হাঁ মা, ঠিক্‌মত কর্‌তে পার্‌লে কাজ হয় বৈ কি ? যাঁরা উচ্চ সাধক তাঁরা আরও ভাল ক্রিয়া কর্‌তে পারেন।

অভিজ্ঞ পিতার সঙ্গে ক্ষুদ্র বালিকা যেরূপ কথাবার্তা কয় মা সেই ভাবে কথাবার্তা কহিতেছেন। আব্‌দার এবং নিতান্ত বিনয়ের সহিত প্রশ্নাদি করিয়া ব্রাহ্মণকে বড়ো করিতেছেন ও নিজকে ছোট করিতেছেন। (ব্রাহ্মণ নিজকে লঘু জ্ঞান করিতেছেন ও মায়ের কথায় সঙ্কুচিত হইতেছেন, তাই কথা কহিতে মার বিনয়ের সহিত আব্‌দারের ভাবও প্রকাশ পাইতেছে)।

ব্রাহ্মণ তাই বলিলেন, "আপনাকে দেখ্‌বার জন্য কত লোক এসেছে, আমাকে দেখ্‌বার জন্য ত কই লোক আসে না।"

মা—বাবা গো ! শুন, মেয়েটাকে সকলে স্নেহ করে তাই এসেছে। ওরা সকলে মেয়েটাকে

নিজের মেয়ে ব'লে মনে করে তাই এসেছে। বলে না—নিজের প্রাণের মত ভালোবাসি!

ভাবের সঙ্গে যার মিলে তারে ভালো লাগে। তাই সকলে যে এখানে আসে আমি বল্‌ব, নিজেরই কাছে আসে।

ব্রাহ্মণ—কই আমার কাছে ত আসে না।

মা—আমি বল্‌ব, তোমার কাছেই আসে, কারণ তুমি আমি কি আলাদা নাকি?

ব্রাহ্মণ—আপনি উঁচা স্তরের, আমরা নীচের স্তরের, তাই আপনার কাছে আসে।

মা—বাবা, মেয়েকে ওরকম কথা বলে না, অহঙ্কার বেড়ে যাবে।

সকাম, নিষ্কাম কর্মের কথা উঠিল।

ব্রাহ্মণ—নিষ্কাম কর্ম নাই, ঈশ্বরপ্রীতিতে কর্মকেই নিষ্কামকর্ম বলা হয়। কিন্তু ওটাও ত কামনা।

মা—হ্যাঁ, যে কামনায় সব কামনা নষ্ট হয়ে যায় সেই কামনা।

জনৈক ভক্ত—সংখ্যাজপ না রেখে সদা সর্ব্বদাই জপ করি, তা কিরকম হয়?

মা—বাঃ অজপা জপই ত আমরা চাই। সর্ব্বা-

বস্থাতেই ত শ্বাসপ্রশ্বাস চল্‌ছে, জপ যদি সেই সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে থাকে সে ত ভাল কথা।

নাম ও বীজের পার্থক্য কি এ বিষয়ে কথা উঠিল। মা পণ্ডিতকে নাম ও বীজের পার্থক্য জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত একরকম বলিলেন। মা'ও এ বিষয়ে অনেকগুলি কথা বলিলেন।

"(সংক্ষিপ্ত)" **নাম জপ যদি অনবরত করা যায় তাহার ভিতরের ভাবটিই নামীর দর্শন লাভ করাবে। কারণ, তিনি ত ভাবগ্রাহী। গলাভাবে তাঁর নাম নিলেই সব আপনা আপনি হয়ে যাবে। গ্রন্থিটন্থি যা খোলার খুল্‌বে।**

নাম নিতে নিতে বীজ ভিতরে স্ফুরিত হ'তে পারে এবং এইভাবে সাধককে অগ্রসর ক'রে দিতে পারে (দেখা যায়)।

* * * *

আমাদের ষট্‌চক্র এবং গ্রন্থিটন্থি যে সব রয়েছে, আমরা যদি বীজমন্ত্র জপ করি বীজমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে সব ঝঙ্কার দেয়। দেখ না বীজমন্ত্রের মধ্যে আলাদা সব রয়েছে অনুস্বার,

বিসর্গ, যুক্ত-অক্ষর এই সব। বীজমন্ত্র ঠিক্‌ভাবে উচ্চারণ কর্‌লে গ্রন্থি খোলার কাজ হ'তে থাকে।

মোটের উপর নামের দ্বারা গলাভাবে গ্রন্থি খোলার কাজ হয় আর বীজ দ্বারা ঝঙ্কারে গ্রন্থি খোলার কাজ হয়।"

মা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে কি ভাবে কথা কহিতেছেন তাহা বলি। কথা কহিবার ভঙ্গী ছোট্ট মেয়েটির মত অথচ এর মধ্যেই এমন সব উচ্চ তত্ত্বের কথা বলিতেছেন যাহার ধারণা করা পণ্ডিতের পক্ষে মুস্কিল।

মা যখন প্রশ্ন করিতেছেন, বলিতেছেন,—

"মেয়ে যেমন আব্‌দার ক'রে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে সেইরকম ভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"

কেহ আবার কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেছেন,

"এ সব কথা বাবা বল্‌লেই ভাল হয়, আমি কি বল্‌ব? আমি তো আবোল-তাবোল বলি; শাস্ত্র জানি না, লেখা জানি না, পড়া জানি না।"

বৃদ্ধ সংস্কৃতে কিছু শ্লোক বলিলে বলিতেছেন,

"বাবা, মেয়েটাকে তুমি কি সংস্কৃত শিখাইছিলা? বাবা, বাঙ্‌লায় কও।"

মায়ের ছোট মেয়ের মত মাধুর্য্যপূর্ণ গলাগলা ভাবে সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন।

মা—**দেখ, ভাবটা যদি 'তিনি' এই ভাব হয় তা হ'লে যে নামে কেন না ডাক, হবে। 'গাছ, গাছ' ক'রে ডাক্‌লেও গাছের মধ্য দিয়াই সেই চৈতন্যসত্তার স্ফুরণ হবে। একমাত্র ত তিনিই। জলই তরঙ্গাকারে রয়েছে। তরঙ্গটাও ত জল ছাড়া কিছুই না। কাজেই তরঙ্গের মধ্যে দৃষ্টি কর্‌লে 'জল' এই বোধ আসবেই।**

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল।

18th December, 1939. বেলা আন্দাজ ১১টা।

কলিকাতা। লেকের ধারে একখানি নূতন বাড়ীতে মা থাকেন। মায়ের কাছে প্রত্যহই বহু ভক্তের সমাগম হয়। নিত্যই উৎসব। কীর্তনাদিতেও খুব আনন্দ হয়।

দুতলার উপর একখানি ঘরে মা চৌকীর উপর বসিয়া। ঘরে অনেকেই আছেন। কথাবার্তা চলিতেছে।

একজন—আপনার দয়া হ'লেই হয়।

মা—**হাঁ, আপনার দয়া হ'লেই হয়। এক আপ্‌নি আছেন, আপনার দয়া হ'লেই হয়।**

একেবারে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হ'য়ে যাও, ওষুধটা আছে সঙ্গে সঙ্গে; এখন আর ছাড়্‌তে পার না, ডাক্তার যখন নিযুক্ত হয়েই গেছে। তা না হ'লে হয় না। ঘরে এসে খেলেই গোল হ'য়ে যায়, পথ্যপাচনেরও বেশ্‌কম হয়।

যতীশগুহের মাতা— মা, তুমি কথায় কথায় বল, 'সে' করবে। 'সে' কে মা ?

মা—তা'র পাশ ফিরবার যায়গা নাই।

মা হাসিতেছেন।

যতীশগুহের মাতা— সে কি রকম ?

মা—যা রকম দেখ্‌তে পাচ্ছ, যা রকম দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, এই সবই তাঁর রকম।

মা হাসিতেছেন, আবার বলিতেছেন,

"কি, বাদ দিবে নাকি তোমরা ? যে যেমন দেখ্‌তে চায়, যে যেমন দেখ্‌তে পায় সে তেমনই।...বুঝ্‌তে পেরেছ ?"

যতীশগুহের মাতা— মা, একরকম না বহুরকম ?

মা—যত রকম আছে। ঐ একরকম বল একরকম, বহুরকম বল বহুরকম।

যতীশগুহের মাতা— সুন্দর কথা! মা, বেশ লাগে।

মা—মুখরোচক, চাট্‌নি! কতক্ষণ বাদেই, কতক্ষণ আর কি, চলে গেছে।

খুকুনীর পিসীমা মাকে একজনের কথা বলিতেছেন, "তোমাকে সংসারী অবস্থায় দেখেছিল, তোমার কাছে আস্‌তে চায় কিন্তু সাহস পায় না; ভাবে সংসারীর সাথে তুমি কথা বল্‌বে কি না কে জানে।"

মা বলিলেন,—

"তুমি বোলো, ইনি একেবারে সংসারী। বল্‌বে যে, তখন যেমনটি দেখেছিলে, একবিন্দু এদিক সেদিক হয় নি। শরীরটা বড়, ছোট। বিদ্যাকূট, খেওড়া টেওড়ায় আমিও গিয়ে "মেসো, মাসী" বেশ করে লাগিয়ে দিয়েছি।

আগে যা, পরেও তা; যেমন তেমনটি।

'আগ, পর' আবার কথা আছে নাকি? যেমন তেমনটি।...বলা যায় না, না? বলা যায় না সব।"

মা হাসিতেছেন, বলিতেছেন, "**মোটামুটি বলা যায়।**"

অমূল্যচরণ দত্তগুপ্ত ও তাঁহার ভাই অক্ষয়বাবু বসিয়া আছেন। মা অক্ষয়বাবুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,

"বাবা একটু কাণে কম শোনে নাকি?"

অমূল্যবাবু—হাঁ।

মা—ভিতরে ভিতরে শোনা ভাল; বাইরের কাণে কম শোনে এ'ত ভালই হয়েছে।

বিকাল। মায়ের দরজা খোলা হইয়াছে। ঘরে অনেক লোক মায়ের দর্শনের জন্য সমবেত।

বীরেন মহারাজ—মা, তোমার মঠটঠ হয়েছে নাকি, শুনি।

মা—বাঃ কত মঠ হচ্ছে, যাচ্ছে; তার কি? এই যে মঠেই আছি। (সকলকে দেখাইয়া) এই যে এত সব মঠ, গুণতে পার? * * * একদিকে মঠ ভাঙ্গ্ছে, একদিকে গড়্ছে।

বীরেন—ভাঙ্গে গড়ে কে?

মা—যার ভাঙ্গা গড়ার গরজ সেই ভাঙ্গে গড়ে। * * *

মা একজন বৃদ্ধকে দেখাইয়া রেবতীবাবুকে (১) বলিলেন, "বাবাকে বলেছিলাম, 'বাবা, মিছ্রি মুখে রেখো, গ'লে গ'লে রস পড়্বে। তার মানে নাম ভিতরে রাখ্বে আর নামরস পান কর্বে। তা দেখি বাবা বাস্তবিকই মিছ্রি এনে খাচ্ছে।

(১) শ্রীরেবতীমোহন সেন, শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য।

তা ভালই হয়েছে। এতে সকলের, 'নাম মনে রাখ্‌তে হয়' এটা মনে থাক্‌বে।

24th December. 1939.

লেকের ধারে বাড়ী, কলিকাতা।

মা ভক্তগণের সহিত আলাপ করিতেছেন। মা বলিতেছেন,

"ছুটাছুটি যদি কর্‌তে হয় ঐ (সৎ) সঙ্গের জন্যই যেন হয়। আর যতটুক ততটুক। যতটুক লেকের পারে ততটুকই জলের হাওয়া লাগে।"

জনৈকবৃদ্ধ—আমরা ভোগটাই চাই।

মা—কই, ভোগ চাই কই? আমরা ত্যাগই ত চাই। এ'ত ত্যাগ হওয়ার জিনিষ। আসল ভোগ চাই কই? আসল ভোগ্য জিনিষটা আমরা ত্যাগ ক'রে ব'সে আছি।

...আসল কথা কি বাবা! গুরুকৃপাই হচ্ছে সব।

ঐ ভক্ত—গুরু কি এঁদের দেখাদেখি খুঁজে নেব, না তিনি নিজে দেখা দিয়ে কৃপা কর্‌বেন?

মা—দেখাদেখিটা হচ্ছে কেন? যোগাযোগ কেন হ'য়ে যাচ্ছে? কাজেই গুরুকৃপাই বল্‌ব।

ঐ ভক্ত—গুরুবাক্য পালন যদি না কর্‌তে পারি সেই ভয়ে গুরু কর্‌তে ইচ্ছা হয় না।

মা—পাথর বল্‌লে শিব বলা হয় না, শিব বল্‌লে পাথর বলা হয় না। সেই হিসাবে চেষ্টা তাও গুরুকৃপায় হয়।

ছেলে পেলেরা লেখাপড়া করে। একটু লেখার দিকে গেছে ত? (বলে) বাঃ বেশ্‌ সুন্দর হয়েছে। পরে ভুল দেখিয়ে দেয়, কেটে দেয়। গুরুবাক্য পালন কর্‌তে পারি না পারি, 'নেব না' তা নয়। আশ্রয় আমি নেব, না পার্‌লে তিনি আমায় গড়িয়ে নেবেন।

...দুর্ব্বলতার আশ্রয় নেবে না, নিতে হ'লে সবলতার আশ্রয় নেবে।

পুরী ও ভুবনেশ্বরে

(সংক্ষিপ্ত)

২১শে মাঘ, রবিবার (4. 2. 40.) সকালবেলা মা পুরী পৌঁছিলেন। মা যেখানে রহিলেন ঐ আশ্রমটি একেবারে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। মায়ের সঙ্গে দেবীজী

যোগেশদা (ব্রহ্মচারী), নিশিকান্ত মিত্র (ইনি অনেকদিন যাবৎ মায়ের আদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া সাধন ভজন করিতেছেন), স্বামী অখণ্ডানন্দজী, পরমানন্দ স্বামী (শ্রীব্রহ্মজ্ঞমায়ের আশ্রিত, অনেককাল গঙ্গোত্রীতে ছিলেন) প্রভৃতি অনেকে আছেন। আজকাল পরমানন্দ স্বামী ও মেজদি (শচীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের ভগ্নী) এঁরাই মায়ের সেবা করেন।

মা প্রত্যহ সমুদ্রের তীরে বেড়ান। বালির উপর কোনও জায়গায় বসেন। আমরা সকলে ঘিরিয়া বসি। শিশির রাহা রোজই আসেন। স্বামী পবিত্রানন্দ (শ্রীকৃষ্ণা-নন্দ পরিব্রাজকের আশ্রিত) মাখন লাল গাঙ্গুলি, বীরেন্দ্র নাথ রায় প্রভৃতিও মাঝে মাঝে আসেন। কড়ার আশ্রমের সেবানন্দজী সরস্বতীপূজার দিন মাকে তাঁহাদের আশ্রমে লইয়া গেলেন।

কৃষ্ণা মা (মনোরমা) প্রায় প্রত্যহ আসেন। ইনি খুবই উচ্চ অবস্থার কোন সন্দেহ নাই। বহুকাল সংসার ছাড়িয়া শান্তি লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া সাধনা করিতেছেন। মা যখন ঢাকায় ছিলেন তখনই ইনি মায়ের কাছে আসিতেন। তখন গৃহস্থাশ্রমে হইলেও ভগবানের জন্য ব্যাকুল ছিলেন এবং সাধনে তীব্র নিষ্ঠা

ছিল। মার প্রতি এঁর এতটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল যে গুরুনিষ্ঠা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে মায়ের কাছে আসিতে চাহিতেন না। কিন্তু ব্যাকুলতা ইঁহাকে টানিয়া লইয়া আসিত। আবার আসিয়াও মায়ের দিকে ভালো করিয়া তাকাইতেন না এবং স্পর্শ করিতেন না এরূপ হইয়াছে। এ এক অদ্ভুত প্রেমের লীলা।

কৃষ্ণা মা ৺কাশীতে যখন সাধনা করিতেছিলেন তাঁহার ভিতরের অনেক কিছু খুলিয়া যায়। দর্শনাদি খুবই হইতে থাকে। এই সময় মায়ের দর্শন ও বাণী পাইতেন। কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তি পাইলেন না। স্থায়ী আনন্দ পাইবার জন্য তাঁর বুকের ভিতরটা সর্ব্বদাই হু হু করিত। ক্রমে আনন্দ আপনা আপনিই পাইতে লাগিলেন।

মায়ের পুরীতে আসিবার পর কৃষ্ণা মার সহিত যে অন্তর্জগতে সাক্ষাৎ হইত তাহা মায়ের মুখেও শুনিয়াছি। একদিনের ঘটনা বলি।

একদিন সকালে কৃষ্ণা মা আসিয়াছেন। মা বলিলেন,

"কাল সারাটি রাত্র তুমি (আমার কাছে) ছিলে।"

কৃষ্ণা মা চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বল্লিলেন,

"আমি তো চুপ্ করিয়াছিলাম, তা' তুমিই আগে কহিয়া দিলা।"

আমি একান্তে মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি দেখিয়াছিলেন?"

মা যতটুকু বলিলেন মোটের উপর তাহা এই—

"অনেক ব্যাপার হ'ল। এ শরীরটাকে ক্ষুদ্র শিশুর আকারে ও পেল। ওর ভাবটা তাজা একেবারে। ওকে অনেক কিছু বুঝান হ'ল। সবটাই যে একসত্তা এই তত্ত্ব। ওকে যা যা বলা হচ্ছে সেটাই ও অন্তরে উপলব্ধি করে নিচ্ছে, আর ভাবটা কিরকম স্থির দেখা গেল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় দেখেছিলেন?

মা বলিলেন, **"জায়গা টায়গা খেয়াল নেই, একটা স্থানে ও আর আমি আছি।"**

কৃষ্ণা মা এসকল সম্বন্ধে প্রায় কিছু বলিতে চাহেন না। আমার আগ্রহ দেখিয়া ঐ রাত্রের ঘটনা খাতায় যা লিখিয়াছিলেন আমায় আনিয়া দিলেন।

বেশ এক ছন্দে লেখা। বলিলেন, আপনা আপনিই বাহির হইয়াছে। উহা পড়িয়া বুঝিলাম, সেদিন রাত্রে মায়ের সহিত তাঁহার এক অপূর্ব্ব লীলা সংঘটিত হইয়াছিল।

মা তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময়ী, চিণ্ময়ী রূপ সব দেখাইলেন। তাঁহাকে লইয়া উদ্‌দণ্ড নাচিয়া ছিলেন। তাহার পরে তাঁহাকে তত্ত্বকথা বুঝাইতে লাগিলেন। "এক হইব তোমাতে আমাতে।" কৃষ্ণা মা জননীর কৃপাকে অহৈতুকী কৃপা বলিয়াছেন এবং অশেষ করুণার কথা বিবৃত করিয়াছেন।

কৃষ্ণা মা আমাকে বলিলেন "পুরীতে আসার পরও প্রথম দিকে মায়ের উপর আমার একটা অন্য ধারণা ছিল। মাকে শুধু বড় বলিয়াই জানিতাম। সেদিন রাত্রে মা আমাকে যাহা বুঝাইলেন সে কথা আগে বহুবার পাইয়াছি কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে নাই। ঐ দিন রাত্র হইতে অন্তরে বুঝিয়াছি। তবে ভাবটি এখনও পাকা হয় নাই।"

মা হয়ত বসিয়া কাহারও সহিত হাসিয়া কথা কহিতেছেন, কৃষ্ণা মা মা'র পিছনের দিকে বসিয়াও দেখিতে পান, মা তাঁহার দিকেই সহাস্য বদনে কথা কহিতেছেন।

কৃষ্ণা মা বর্ত্তমানে কিরূপ নূতন অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছেন তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম। * * *

একদিন পুরীতে দুপুর বেলা মা শুইয়া আছেন। সর্দ্দি লাগিয়াছে। নাক পুঁছিবার জন্য একখানি বস্ত্রখণ্ড

চাহিলেন। দুপরে মাকে একলাঘরে বিশ্রাম দেওয়া হয়। পরমানন্দ স্বামী দরজা একটু ফাঁক করিয়া রাখিয়া বাহির হইতে মার দিকে দৃষ্টি রাখেন, কখন কি দরকার হয়। সেদিন ঘটনাক্রমে তিনি ছিলেন না। অথচ কেহ (মা বলিলেন না, সে কে) ঘরে ঢুকিয়া মাকে দড়ি হইতে বস্ত্রখণ্ড নামাইয়া দিল। পরে দেখা গেল মা'র ব্যবহারের যেখানি আমাদের ছিল সেখানি নাই। অন্য একখানি কাপড়ের টুক্‌রা রহিয়াছে। তাহাতে হিন্দীতে রামনাম লেখা।

পুরী হইতে ভুবনেশ্বরে গিয়া আমরা (কয়েকজন) কয়েকদিন ছিলাম। সেখানেও নানারকম সব ঘটনা ঘটিত। জটাজুটধারী বৈষ্ণব সাধু (নিম্বার্ক আশ্রমে আমরা ছিলাম, ঐ সম্প্রদায়ের সাধু) সূক্ষ্মদেহে মায়ের কাছে আসিতেন। সূক্ষ্ম জগতের কত লীলা মা বলিতেন। এইজাতীয় ঘটনা আমি পূর্ব্বে সর্ব্বদাই অবিশ্বাস করিতাম, মায়ের পাল্লায় পড়িয়া আর অবিশ্বাস করিতে পারি কই ?

একদিন পুরী হইতে মেজদি ও অখণ্ডানন্দজী আসিলেন। মেজদির মুখে একটি ঘটনা শুনিলাম। মেজদি, রাখাল, সাবিত্রী (মায়ের ভ্রাতৃবধূ), যতীশগুহের মাতা, বুনিদিদি, পিসীমা (ঐরূপ ডাকা হয়) এঁরা সব জগন্নাথদেব দর্শনে

গিয়াছিলেন। জগন্নাথদেবের স্থলে মায়ের মূর্ত্তি সকলে দেখিতে পাইলেন। এই দর্শন কিছু সময় ধরিয়া হইয়াছিল। মেজদি তারপরে মাকে রাজবেশে দেখিতে পাইলেন, মুকুটাদি পরা। তারপরে কালীমূর্ত্তি দেখিলেন।

মায়ের চরণে বার বার প্রণাম করি।

ওঁ তৎসৎ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০	১৩	অদ্ভূত	অদ্ভুত
২১	১১	জ্যোতীশ ও	জ্যোতীশও
৩০	৮	নীরোদবাবু	নীরোজবাবু
৩১	৩	কন্দিতেছেন	কান্দিতেছেন
৩১	১৬	তাঁহার	তাঁহারা
৪৫	৫	তোমার	তোমায়
৬১	১৬	তারই	তাঁরই
৫৭	১	আমার	আমায়